সত্যি শোনা বাঘের গল্প

শিশির মজুমদার

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

সাম্‌পান মজুমদার
ঝাম্‌পান মজুমদার

মলাটের ছবি : মাণিক সরকার
ভেতরের ছবি : পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রাকর
শ্রীমদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

যীশু ও বুল্টিকে

সত্যি শোনা বাঘের গল্প

ঠিক গল্প নয়, ঘটনা।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সীমান্তের একটি গ্রাম। নাম ডাঙ্গাপাড়া। কাছেই মহানন্দা। একদমে ছুটে যাওয়া যায় সেখানে।

ঘটনাটা শুনেছিলাম ওখানে বসেই। তখনো জ্যোৎস্নাটা জাঁকিয়ে ওঠেনি। তাই চারদিক ছায়া ছায়া আলো। ডাঙ্গাপাড়ার চাষের ক্ষেত, চাষীদের খড়ের ছাউনি সবই ভূতুড়ে ভূতুড়ে ঠেকছে ওই হাল্কা জ্যোৎস্নায়। মহানন্দাকে দেখছি একটা তুষের চাদর গায়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে।

এ গল্পের কথক আসলে গোবিন—গোবিন পরভর। বাঙলা মুলুকে থেকে বাঙালী হয়েছে। আবার ডাঙ্গাপাড়ার ঠিক পরেই পূর্ণিয়া জেলা শুরু হওয়ায় একেবারে বিহারীভাবও ছাড়তে পারেনি। ওর মুখের ভাষা মৈথিলী আর দিনাজপুরী।

গোবিন-ই এ ঘটনার নায়ক। তারই জীবনে ঘটেছিল ব্যাপারটা এবং এই ঘটনাটা এখন থেকে পঁচিশ বছর আগের ব্যাপার।

পচ্চিশ্ বছর আগে—হেইঃবাপ্, এই দ্যাশটা জঙ্গল জঙ্গল ছিল্। উই দু'একখান পিদিম দেখা যায়, ও হচ্ছে বাঁশবাড়ী। বাঁশের জঙ্গল।

গোবিন বলতে শুরু করল আমাকে ওর বাড়ীর উঠোনে বসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি এখানেই থাক বরাবর?

ও সাথে সাথে জবাব দিল, জী হাঁ।

কথায় কথায় শুনলাম, চার পুরুষ ধরে ওরা এখানে থাকে। তার আগে ছিল ওই পূর্ণিয়া জেলায়। লোকটার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। রোমশ পেশীবহুল দেহ। লম্বায় পাঁচ ফুটও হবে না। গাঁট্টা-

গোট্টা ধরনের গড়ন। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন উমর কত?

ও হেসে জবাব দিল, তা পচাশ একাওন হছে। হামার যখন এক কুড়ি পাঁচ বছর তখনই তো বাঘটা ধরছিল হামাক্। এককুড়ি পাঁচ বছর জুয়ান মরদ মুই। হামার সাথ যুঝবে কেমোনে?

আমিও হেসে বললাম, তা তো বটেই! বাঘের সাধ্য কি তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে পারে।

গোবিন একটু নড়ে-চড়ে বসে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর একটা সুখের আমেজ তুলল, জিভ দিয়ে শব্দ করে। যেন ধীরে ধীরে পঁচিশ বছরের জোয়ান মরদটা তার ভেতরে প্রবেশ করছে। সে বলতে শুরু করল পঁচিশ বছর আগের ঘটনাটা।

সে বরষ বাঘের ভারী দাপট। গোহালে গোরলা, বাছিলা, ছাগল রাখা দায়। ডাঙ্গাপাড়া বাঁশবাড়ীর তামাম চাষী খুবই শোচ (চিন্তা) করসে। চারমাইল দূরে সোনাপুরে ঠাকুর সায়েবের একটা মাত্র বন্দুক আছে! ব্যস্। তাই গোবিন পরভররা গ্রামে পালা করে সব রাত জাগে। টিনের ক্যানেস্তারা, মশাল জ্বালিয়ে পাহারা দেয়।

উ সাল যিমন ছিল্ গরমি, তিমন জার (শীত)। মানুষ মরে জারে গরমিতে। তার উপর বাঘের দাপট—হেই বাপুইরে ছুয়া গুলানরে (ছেলে-পিলে) সামাল দায়।

আজ সুকুলের ছাগল, কাল বেপারুর ভেড়া গোয়াল থেকে উধাও হতে শুরু করল। সম্পত্তি বলতে এই সবই ওদের। গোবিন বলে, ঘরপুড়ীর ক্রোধ হছে। ই একেবারে সরঝের বাহার হো গেল্। হামরা সব গেরামের মানুষ আওয়াজ তুইলে মিটিং দিলম্।

মিটিং-এ ঠিক হল পরদিন দুপুরবেলা বাঘের খোঁজে বেরোনো হবে। সোনাপুর থেকে আনা হবে বন্দুক-হাতে ঠাকুর সাহেবকে। সায়েব একটু ভীতু লোক। তা হলেও সবাই মিলে তাকে হাত জোড় করে বলা হবে। টিন ঘণ্টা মিরদং সব নিয়ে যত রকমভাবে শব্দ তোলা যায় তার ব্যবস্থা করে বাঘের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া হবে।

পরদিন দুপুরবেলা একটা বেশ বড়ো দল বেরিয়ে পড়ল বাঘের খোঁজে। লাঠি, সড়কি, বল্লম, কাটারি প্রভৃতি হাতিয়ার নিয়ে। ঠাকুর সায়েব এলেন বন্দুক নিয়ে। আওয়াজ করার সব রকম যন্ত্র নেওয়া হল সাথে। কেননা, বাঘের আওয়াজে বড়ো ভয়। সার বেঁধে সবাই রওনা দিল বাঘ ধরতে। গোবিন বলল, কিন্তুক্, হামি পড়ল সবার পাছৎ। কপড়াটো আচ্ছা কষে কোমরৎ বাইন্ধে চললম দলের সাথ।

মহানন্দার জল তখন হাঁটু ছুঁই ছুঁই। স্রোত ছিল একটুক্ একটুক্। ওপারে জঙ্গল গহীন। দিনের বেলাই অন্ধকার। মহানন্দা থেকে একটা খাড়ি ঢুকে গেছে বনের ভিতর। বর্ষাকালে জল ঢোকে সেখানে।

তখন শীতকাল। শুক্‌নো খাড়ি। বালি বালি, পাথরের চাঁই আছে কয়েকটা পড়ে। দলটা চলল ওই খাড়িপথ ধরে। খাড়ির উপর দুধারে বনভূমি। হাতের কাছে গাছের গোড়ায় উঁচু শব্দ তুলে কেউ কেউ লাঠি সাপটায়। মুখ দিয়ে সবাই হল্লা করে বিচিত্র শব্দে। ক্যানেস্তারা ঘণ্টা সবগুলো যন্ত্র আওয়াজ তোলে। ওই সব শব্দ শুনলে মনে হবে প্রলয় বুঝি শুরু হয়েছে।

গোবিন একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে আচমকা খাড়ির মধ্যে পড়ে যায়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে দেখে তার দলটা খানিক এগিয়ে গেছে শব্দের ঝড় তুলতে তুলতে। আর ঠিক সেই সময়—হেই বাপ, যমদূতটা আমার সুমুখে দুপায়ে ডাইড়ে।

বলতে বলতে গোবিনের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। সেই পঁচিশ বছর আগের ভাবটা তাঁর যেন দেখা দিল। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বাঘটা দুপায়ে হামার সুমুখে তো ডাইড়ে। কম করি হামার চেয়ে এক দু'হাত লম্বা হবা পায়। গায়ে চক্কর চক্কর দাগ। এখুন হামি করি কি। যমটাতো হামারে খাইসে। শরীলের ভিতর কি হইল্ ভগমান জানে। হামি নিঃশ্বাস বন্ধ করি চুপচাপ ডাইড়ে

বলম্। বাঘটা একটুক্ আগাই আসে ওর হাথ্‌ দু'খান বন্ধুর মতো হামার দুই কাইন্ধের উপর রাখিল্। য্যান্ বলবার চাহে 'বন্ধু কি খবর, কেমুন ছে' ?



গোবিন এই ঘটনার বর্ণনা দিতে দিতে সেই বাঘটা ঠিক যেমন করে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে উঠে আমার দুটো কাঁধে তার হাত রাখল।

ওই খোলা আকাশের নীচে আবছা চাঁদের আলোয় আমি গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। গোবিনকে বললাম, তারপর ?

গোবিন আবার বসে বলল যে, বাঘ তো আর আদর করতে

আসেনি তাকে। তার হাত দু'খানা আসলে বড়ো বড়ো দুটো থাবা। দুই বড় বড় নখ তার কাঁধে তো চেপে বসল। কোন যন্ত্রণাবোধও তখন যেন তার নেই।

বাঘটা এরপর গোবিনের কাঁধ দুটো চেপে তার বিকট রাক্ষসের মতো হাঁ গোবিনের মাথার ঠিক খুলির ওপরে বসাল। ঠিক সেই সময় গোবিন প্রাণপণ শক্তিতে বাঘের বগলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে তার হাঁটা খুলে নেবার জন্যে ওপরে তুলে ধরল। ঠিক যেন একটা বিশাল পাথর সে মাথার ওপর তুলে ধরেছে। বাঘটা গোবিনের মাথা থেকে হাঁ খুলে ওপরে ঝুলতে থাকল। পা দাপড়াল। গোবিন আর দেরী না করে বাঘটাকে ওই খাড়ির দেয়ালে আছড়ে ফেলল। বাঘটাও ছটফট করে গোবিনকে আক্রমণ করতে চায়। গোবিন আবার বাঘটাকে তুলে আছাড় মারে ওই খাড়ির গায়ে। এইভাবে একবার দু'বার তিনবার। তারপর গোবিন টলে পড়ে মাটিতে ওই খাড়ির মধ্যে।

এইভাবে সে কতক্ষণ পড়েছিল তার মনে নেই। যখন সে চোখ খুলল, তখন দেখে কখন যেন সন্ধ্যা উতরে রাত্রি হয়েছে। আবার সে রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটেছে সেই জঙ্গলের পাতায় পাতায়। গোবিন চোখ খুলে ঘাড় কাত করে এদিক ওদিক তাকায়। তার চোখে পড়ে সেই বাঘটা অদূরেই পড়ে আছে।

এবার গোবিন বুঝল মৃত্যু তার শিয়রে! বাঘটা যদি না মরে থাকে, তবে তাকে বাঁচাতে পারে কে! স্বয়ং ভগবানও না। গোবিন হাত-পা নাড়াতে পারে না। এতটুকু শক্তি আর তার দেহে নেই।

সে ঘাড় কাত করে আবার বাঘটাকে দেখে। গোবিন চমকে ওঠে। বাঘটাও ঘাড় কাত করে তাকে দেখছে। গোবিন ভয়ে চোখ বোঁজে। সে বুঝতে পারে এইবার বাঘটা উঠে আসবে ধীরে ধীরে। তাকে ধরবে কিন্তু বাধা দেওয়ার শক্তি আর তার যে নেই। চুপচাপ শুয়ে মৃত্যুকে কোলে নেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে সে? কিন্তু সে

কোন সাড়া পেল না বাঘটার। আবার ঘাড় কাত করে সে বাঘটাকে দেখে। কিন্তু এবার দেখতে পায় বাঘটা চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। গোবিন অপলক দৃষ্টিতে বাঘের দিকে চেয়ে থাকে। বাঘটা একবার চোখ খুলে গোবিনের দিকে চেয়েই আবার চোখ বোঁজে।

এইভাবে চলল খানিকক্ষণ। গোবিন বুঝতে পারছে না তার ভবিতব্য কি! এই সময় সে শুনতে পায় তার নাম ধরে কারা যেন ডাকতে ডাকতে এদিকেই আসছে। আর তক্ষুণি ঘটল মজার কাণ্ডটা।

গোবিন পরভর বলে, বাঘটা তো রাস্তে রাস্তে শরীল নাইড়ে নাইড়ে ডাইডে উঠিল্। হামার ঠিনা চক্ষু তুইলে চাহিল্। তারপর রাস্তে রাস্তে চলি গেল্। অবাক কাণ্ড। বাঘও চলি গেল্, হামিও নিসাড় পড়িল্ ফের।

অর্থাৎ বাঘ চলে যাওয়ার পর সে অজ্ঞান হয়ে গেল আবার।

তার জ্ঞান ফিরল শিলিগুড়ি হাসপাতালে দুদিন পরে। মাথায় হাতে বুকে ব্যাণ্ডেজ। ডাক্তার বলেছিল, বাঁচবার কোন আশাই নাকি ছিল না তার। বরাতের জোর গোবিনের।

আমার খুবই আশ্চর্য ঠেকেছিল আক্রান্ত কাহিল বাঘ কিছু না বলে নিঃশব্দে চলে গেল কেন? গোবিনও তাই অবাক। তার গ্রামের মানুষও তাজ্জব বনে গেছে সব শুনে।

গোবিনের সরল দুই চোখে কোন ছলনা বা বাড়িয়ে বলার কোন চিহ্নই আমি দেখিনি। সেদিন গল্প শেষ করে আমরা দু'জন মুখোমুখি চুপচাপ বসেছিলাম অনেকক্ষণ। গোবিন হয়তো স্মৃতিচারণের রেশটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আর আমি ভাবছিলাম সেই বাঘটার কথা।

বাঘের বুদ্ধি

এক ছিল বাঘ। সে খুব অলস। সারাদিন বনের ভেতর একটা জলাশয়ের ধারে শুয়ে বসে থাকত। শুধু শুধু শুয়ে বসে থাকা যায় নাকি! তাই সে মাঝে মাঝে হাই তুলত। হাই তোলার সময় সে তার মুখ দেখত জলাশয়ে। ঝিরঝিরে বাতাসে জলাশয়ে ছোট ছোট ঢেউ উঠত। জল কাঁপত। তাতে হাঁ-করা বাঘের বিকট মুখ অনেক বড় হয়ে যেত। বাঘ তাই চেয়ে চেয়ে দেখত আর নিজেকে খুব বড় মনে করত।

সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা সব যখন গাছে গাছে খুব কিচির-মিচির লাগিয়ে দিত, বাঘ তখন লেজ নাড়াতে নাড়াতে উঠে দাঁড়াত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবত, এক-আধটা শিকারের খোঁজ-টোঁজ নেওয়া যাক, পেটে কিছু পড়া চাই তো।

আজ সারাদিন হাতের কাছে কোন শিকারই এল না। ধুত্তোর —এই ভেবে সে একবার ডাইনে চায় আর একবার বাঁয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে চায়! তারপর একটা চাপা শব্দ করে, হুম্।

শিকার—সে তো ধরা খুব সোজা। বাঘ ভাবে। সিধে ডান দিকে গেলেই গাঁ পাব। সেখানে থরে থরে সব নধর বাছুর আছে ঘরে ঘরে। ব্যস্, একটা তুলে নিয়েই দেব চোঁচা দৌড়। সোজা এখানে এসে বেশ মৌজ করে খাব। ভাবতে ভাবতে বাঘের ডান গোঁফটা দু'দুবার নেচে ওঠে।

আচ্ছা ধরা যাক, যদি বাঁ দিকের গাঁ-টায় যাই। সেখানে রয়েছে হৃষ্টপুষ্ট চকচকে ছাগল। এ মুখে তার গোটা দুই তুলে আনা কোনো ব্যাপারই নয়। কতটুকুই বা পথ। এখানে এসেই বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যাবে।

ভাবতে-ভাবতে বাঘের মুখটা ফাঁক হয়ে একটু লালা ঝরে পড়ে। বাঘ আবার ভাবতে শুরু করে।

পশ্চিম গাঁ-টাই বা কি খারাপ বাপু। ওদিকে তো শুয়োরের খোঁয়াড়। এক জায়গায় কত কত শুয়োর কিল্‌বিল করছে, আহ্‌, একখানা তুলে নিলেই তো জম্পেশ খানা।

থাক, আর ভাবাভাবি নেই। একদিকে গেলেই হল। শুধু পুব দিকটা বাঁচিয়ে। ওদিকে বড্ড মানুষের ছানা-পোনা। আর ছানা-পোনা মানেই ঝামেলা। যদিও একটা মানুষের ছানা মানেই সেরা খানা। কিন্তু তাতে বড্ড হ্যাপা। ওসব ভাবনা এখন থাক। এবার মনটাকে ঠিক-ঠাক গুছিয়ে নিয়ে হাঁটা।

হাঁটতে গিয়ে পা নাড়াতেই বাঘ ভাবে, এত সাত-তাড়াতাড়ি কিসের? একটু রাত্তির হোক না! বেশি রাতে শিকার পাওয়া যাবে বেশ।

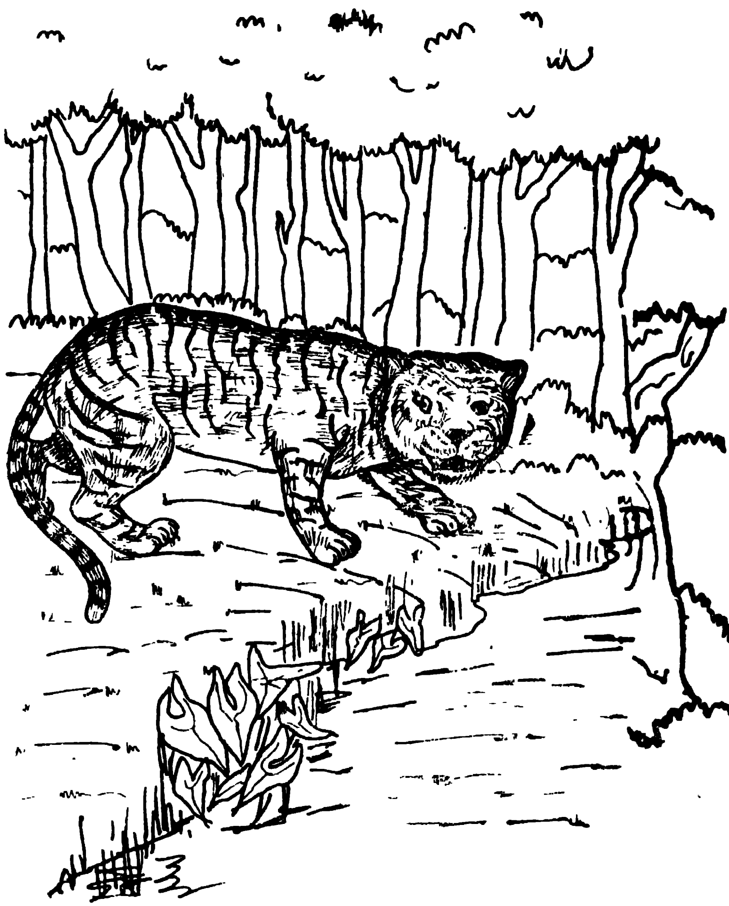
বাঘের ছিল একটা দোষ। একটু ভাবতে গেলেই তার তেষ্টা পায়। তাই, সে ওই জলাশয়ের ধার ছাড়তে পারে না। এতক্ষণ ধরে অনেক ভেবে ফেলায় বাঘের তেষ্টা লাগে ভীষণ। সে তাই সোজা নেমে যায় জলে। পেট ভরে তেষ্টা মিটিয়ে গোঁফ চুম্‌ড়ে একটা উদ্‌গার ছাড়ে। সেই উদ্‌গারের শব্দে বন ওঠে কেঁপে।

তেষ্টা তো মিটল। ভাবাটাবা তো হল। এবার কী করা? পায়ে পায়ে গাঁয়ের দিকে যাওয়া। তা, আরেকটু রাত্তির হোক। এখন বিশ্রাম করা যাক। বাঘ বুদ্ধি স্থির করে।

বাঘের এতেই বড় আরাম। লেজ গুটিয়ে শুয়ে শুয়ে সে সাত-পাঁচ ভাবতে পারে সারাদিন। ভাবেও তাই। লেজ গুটিয়ে শুয়ে শুয়ে সে চেয়ে চেয়ে দেখে জলাশয়ের চারপাশ। আর ওই দেখতে দেখতে ছোট-খাটো শিকার তার সামনে পড়ে যায়। একটু গা নাড়িয়ে গপ্‌ করে ধরেও ফেলে তাই। কিন্তু আজ কি হল। কোনো শিকার-টিকার—

এখন একটু বিশ্রাম করা যাক তো! রাত্তির-টাত্তির একটু বেশি হোক তো!

ধীরে ধীরে রাত বাড়ে। বনে পাখিদের কোন সাড়া নেই। শুধু দূর থেকে ভেসে আসে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া।



খিদে পায় বাঘের। বিশাল লেজটা দুবার নাড়ে। এই উঠি, এই উঠি করে ওঠা আর হয় না।

এই সময় শোনা যায় তার বাঘ বন্ধুদের আওয়াজ। ওরা যে যার মতো শিকার-টিকার নিয়ে বাড়ি ফিরছে তখন। বাঘ অনেক কষ্টে

একটা শব্দ করে ডাকে ওদের—হালুম হো গালুম। অর্থাৎ কী গো ভায়েরা আজ কী শিকার পেলে ?

বন্ধুরা সবাই তাকে চেনে। পারতপক্ষে তারা ওই অলস বাঘের পথ মাড়ায় না। আজ মুখর, তুখোড় বাঘেরা একটু মজা করার জন্যেই ইচ্ছে করে এদিকে পা বাড়িয়েছে। মুখর বাঘ তার মুখ থেকে একটা ধেড়ে শুয়োর সামনে রেখে বলে, যা দিনকাল পড়েছে দাদা, কি আর শিকার মিলবে বল ? কোনোরকমে পেট বোজানোর ব্যবস্থা আর কি !

অলস বাঘ লোভা-লোভা চোখে ওই ধেড়ে শুয়োর দেখে। শব্দ করে, হুম্।

ওই শব্দ শুনে মুখর, তুখোড় বাঘেরা চাপা হাসি হাসে। তারপর, মুখে শিকার নিয়ে সব চলে যায়।

বাঘ তবু শুয়ে থাকে। নিজের প্রতি রাগও হয় না তার একবার। পরক্ষণেই দুঃখে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সেই নিঃশ্বাসে তার সামনে পড়ে থাকা শুকনো পাতা সব উড়ে যায়।

বাঘ ভাবে, আজ রাত্তির কি শেষ হয়ে গেল ! মাথার উপর গাছ-পাতার ফাঁকে আকাশ দেখে সে রাত আন্দাজ করে।

নাঃ, আজ থাক। কাল সারাদিন শুয়ে শুয়ে ফের ভাবব। ভেবে ভেবে ভাল করে বুদ্ধি খাটাব। তারপর যাব শিকার ধরতে।

পরের দিন সকাল থেকেই খিদেতে তার পেট চনমন করে। খিদের চোটে আলস্য ঝরে পড়ে তার। ঘন ঘন জল খায়। আর ভাবে, আয় রাত্তির, তাড়াতাড়ি আয়।

অবশেষে রাত্তির আসে। এর মধ্যে সে সারাদিন ধরে ভেবেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে রেখেছে। এক রাত্তিরে সে উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিমের গাঁ থেকে এমন শিকার জোগাড় করে আনবে যে, তার সব বাঘ বন্ধুরা তাকে হিংসে করবে। মুখর তুখোড়রা এসে তাকে তোয়াজ

করবে। একমাস বসে বসে ওই শিকার খাবে সে। এক ফোঁটাও কাউকে দেবে না।

আজ আর বেশি ভাবাভাবি না।

বাঘ সব আলস্য ঝেড়ে বন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দখিনে গাঁয়ের পথে। সে ভাবে, দখিনে গাঁয়ে বাছুর আছে থরে থরে। কিন্তু এ কী! চলতে চলতে তার গা ছম-ছম করে কেন? শরীরটা বেজায় খারাপ খারাপ ঠেকে যে!

বাঘ ভাবে, থাক দখিনে গাঁ। আগে উত্তুরে যাওয়া যাক। উত্তুরে গাঁ এই তো খুব কাছে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সে মুখ ঘুরিয়ে উত্তুরে গাঁয়ের পথে চলতে থাকে।

চলতে চলতে তার ভাবনা আসে, যদি ওদিকটায় কোনো ছাগল-ছানা না পাওয়া যায়। বোকার মতো ওদিকটায় যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। বাঘ বন্ধুদের কাছে আগে থেকে খবর-টবর নিলে হত। নাঃ, ওদিকটা যাওয়া পোষাবে না।

চলতে চলতে বাঘ এইসব ভাবে। ভাবতে ভাবতে তার চলা যায় থেমে। তখন তেষ্টা পায় বাঘের, সে কঠিন তেষ্টা। হন্যে হয়ে জলাশয় খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পায় জলাশয়। প্রাণভরে সে তেষ্টা মেটায়।

এবার আবার হাঁটা। আসলে হাঁটা-চলা একেবারে না করায় বাঘের হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। তার উপর খিদের দাপট।

সে হাঁটতে থাকে পশ্চিমে গাঁয়ের দিকে। একটু আনমনে। হঠাৎ তার মনে হয়, আচ্ছা একটা বুদ্ধি করা যাক্। এইসব ছাগল, গোরু, শুয়োরে নজর দিয়ে কী হবে! এসব বড়ই ছোট নজর। তার বাঘ বন্ধুরাও এই ছোট নজরে ছোট শিকার করে! তাহলে তার সঙ্গে ওদের তফাৎ কোথায়?

তবে তার বুদ্ধিটা এই। একবারে সেরা শিকার। মানুষের

বাচ্চা শিকার। বাঘ-বন্ধুদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। সে তো রোজ রোজ ওদের মতো শিকারে বেরোয় না। ওসব ছোট-খাট ব্যাপার তার পোষায় না। শিকারে বেরোলে শিকারের মতো শিকার করতে হয়।

কোন্ দিকের গাঁয়ে যেন—ও হ্যাঁ, পশ্চিমের গাঁয়। থুড়ি! পশ্চিমের গাঁয়ের পথেই তো সে দাঁড়িয়ে আছে। জব্বর বুদ্ধিটা তার মাথায় আসতেই দেখে মাথা খারাপের জোগাড়। না, না, এ সময় মাথা খারাপ করলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চুপিসারে পুবের গাঁয়ের পথে চলতে হবে।

এই ভেবে বাঘ, ছবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেয়। তারপর পা টিপে টিপে পুবের গাঁয়ে মানুষের বাচ্চা মুখে তুলতে এগোয়।

এখন গরমের সময়। ছ-পাঁচটা মানুষের বাচ্চা কি আর রাস্তার ধারে বা মাঠের মধ্যে ঘুমুবে না!

বাঘ পথ হাঁটে, খুশিতে ডগমগ হয়ে মাথা নিচু করে। চুপিসারে। দেখতে দেখতে বাঘ গাঁয়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে, হঠাৎ একেবারেই হঠাৎ, সে শুনতে পায়, কা-কা। এ কী! বাঘ চোখ তুলে চায়। দেখে ছ'পাশে সারি সারি ঘুমন্ত সব বাড়ী। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। সেই ফাঁকে একটা কাক ন্যাড়া গাছের ডালে বসে ডেকে উঠেছে—কা-কা।

বাঘ লেজ তোলে। এক লাফে পেছন ফেরে। এই সময় কে যেন চিৎকার করে ওঠে, বাঘ, বাঘ।

ব্যস, বাঘের বুদ্ধি গেল ভেস্তে।

বুলবুলির জাহাজ

বুলবুলির ছাই কিছু ভাল লাগে না! পচা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে ক'দিন ধরে। আজ সকাল থেকে তো আকাশের হাঁড়ি মুখ ভারী হয়েছে। ভোরবেলায় ঝমঝম করে বেশ খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাতেও পচা আকাশ এতটুকু হাল্কা হয়নি। তখন অবশ্যি বুলবুলির ভালোই লাগছিল! চালের উপর বৃষ্টির একটানা ঝমঝম জলের শব্দে তার কেমন ঘুমঘুম আমেজ লাগছিল। একটা বেশ মজা মজা ভাব।

কিন্তু ছাই! মজার বৃষ্টির একটু রেশ কমতেই মা'র সেই রোজকার গলা শোনা গেল। বুলবুলির প্রতি মিষ্টি আদেশ—বুলবুলি, মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে বসো। এ-কথাটা শুনলেই তো বুলবুলির গাটা কেমন গুলিয়ে ওঠে।

কি আর করা! বুলবুলি তাড়াতাড়ি পড়ার টেবিলে এলো। কিন্তু পড়তে বসবে কি? রাস্তা আর মাঠে যে জল থৈ থৈ। তার উপর বৃষ্টির ফোঁটা কেবল ঝরছেই ঝরছে। এমনি দিনে তো এক ছুটে ঐ জলটা মেপে আসতে বুলবুলির ইচ্ছে করে কিংবা হাওয়াই চপ্পল পরে একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো। এমনি সময় মার আবার সেই আদেশ এলো—গতকালের গ্রামারটা তৈরী করো বুলবুলি। ব্যস, মাথায় উঠলো তার ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে। মা'রা যে কি!

গ্রামার খাতা আর বই টেনে নিয়ে বসল বুলবুলি, দুই একটা পাতা ওলটাতেই সে দেখতে পেলো কার যেন একটা নীল রংয়ের নৌকা ভেসে আসছে। সতুর নাকি? ধ্যাৎ! ও নৌকা এখন আর চলে

না। সে ঐ রকম পুরোনো ধরনের নৌকোটৌকো কক্ষণো বানাবে না। ওতো পাশের বাড়ীর পাঁচ বছরের মিঠুও পারে। আমি একটা লাল রংয়ের বড়সড় জাহাজ বানাবো। যা ভাবা তাই কাজ। টেবিলের ওপর বোকাবোকা চোখ করে পড়ে রইল গ্রামার খাতা আর বই।



চেয়ার ছেড়ে তাকের দিকে তাকাতেই বুলবুলির মাথায় বাজ পড়ল। তার লাল কাগজগুলো কোথায়? এদিক ওদিক তাকাতেই ওর নজর পড়ল দাদার বইয়ের আলমারির উপর। কিন্তু....বলে সে বুড়ো আঙুলটা ছুবার লজেনচুষের মতো চুষলো। তারপর হাইমারো

করে চেয়ারটাকে টেবিলের উপর তুললো। এরপর সে চেয়ারের উপর উঠে গোড়ালিটা উঁচু করে তার জাহাজের জন্য লাল কাগজের বাণ্ডিল পাড়তে গেল।

কিন্তু হঠাৎ এ কি ? চেয়ারটা সরাৎ করে টেবিল থেকে সরে গেল যে। ঘরের ভিতর সব ঘুরছে কেন ? একটা সব কেমন যেন ওলট পালট কাণ্ড ঘটছে না চারদিকে ?····

বুলবুলি আর কিছু মনে করতে পারল না।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে সে দেখতে পেলো বাইরে সকালের সেই টিপটিপ বৃষ্টি ঝরছে আর সে বসে অংক কষছে। পাশেই তার মা শুয়ে আছে। বুলবুলি জানালা দিয়ে দেখলো লাইট পোস্টের উপর দুটো কাক জবর ভেজা হয়ে আরো মজা করে ভিজছে। কাক দুটোর উপর তার ভীষণ হিংসে হলো। হ্যাট্ হ্যাট্ করে তাড়াতে চাইলো। দুবার মুঠো করে ঘুষি ছুঁড়লো। তবু কাক দুটো যায় না। এমনি সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ সে শুনতে পেলো। এমন সময় কে এলো আবার ! একবার পাশে শোয়া ঘুমন্ত মায়ের দিকে তাকালো। আবার কড়া নাডার শব্দ উঠলো। বুলবুলি এবার দৌড়ে গেল দরজা খুলতে। দরজা খুলে দিয়ে আগন্তুক দেখে সে তো অবাক। আরে এ যে চেনা চেনা। পেট পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। নীল নীল চোখ····একে কোথায় যেন দেখেছি। ইউরেঁকা। কলম্বাস না ?

বুলবুলির উজ্জ্বল চোখ দেখে কলম্বাস বুঝলেন, বুলবুলি তাঁকে চিনতে পেরেছে। তিনি বুলবুলিকে বললেন, তোমার জন্য একটা জাহাজ নিয়ে এসেছি। চলো বেড়িয়ে আসি খানিক····

বুলবুলি তো ভারি খুশি। স্বয়ং কলম্বাস বলছেন বুলবুলিকে বেড়াতে যেতে ! সে মার কথা, অংকের কথা একবারও না ভেবে কলম্বাসের সঙ্গে জাহাজে ওঠবার জন্য চললো। বারান্দায় বেরিয়ে বুলবুলি দেখে, এ যে তার মনের মতো জাহাজটা। টকটকে লাল রঙ। সে তো এরকম একটা জাহাজই তৈরী করবে ভেবেছিল। বাঃ !

মাস্তুল থেকে তো ধোঁয়াও বেরোচ্ছে না। বুলবুলি তাড়াতাড়ি রাস্তায় থৈ থৈ জলের উপর দাঁড়ানো জাহাজটায় গিয়ে উঠল। সোজা চলে গেল আপার ডেকে। বুলবুলির আরো মজা লাগলো মস্ত জাহাজে একা কলম্বাসকে দেখে।

জাহাজটা চলতে আরম্ভ করলো। বুলবুলি ভাবলো, এই ফাঁকে কলম্বাসকে কয়েকটা প্রশ্ন করে নিই। সে কলম্বাসকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা আপনি আমেরিকাকে ভারত ভেবেছিলেন কেন?

কলম্বাস দাড়ি নাড়িয়ে জবাব দিলেন—ভারতের প্রতি আমাদের একটা ভালোবাসা আছে। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম, ভারত আবিষ্কার করলাম বুঝি। এবং এটা ভেবে ভীষণ খুশী হয়েছিলাম।

কলম্বাসের একথা শুনে বুলবুলির তো আর আনন্দ ধরে না। সে দাদা বাবার মুখে শুনেছে সমস্ত পৃথিবীরই ভারতের প্রতি আকর্ষণ আছে। বুলবুলির হঠাৎ নজর পড়ল তাদের জাহাজটা হাওড়ার পুলের নীচ দিয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা নীল রংয়ের জাহাজ। এমনি একটা জাহাজ দাদার সঙ্গে আউটরাম ঘাটে সে দেখেছিল। বুলবুলি কলম্বাসকে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

কলম্বাস বললেন বঙ্গোপসাগরে। সামনেই রূপনারায়ণ গঙ্গা তারপরেই····

বুলবুলি হঠাৎ দেখলো, দু'পাশে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল জল আর জল। এবার সে একটা জিনিস লক্ষ্য করল, কোথা থেকে যেন নীল জলের স্রোত ভেসে আসছে। কলম্বাস বললেন, এবার আমরা মোহনার কাছে এসেছি।

বুলবুলি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, নীল আকাশ জ্বল্-জ্বল্ করছে। কয়েকটা শংখচিল ঘুরপাক দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মজা হল একফোঁটা রোদ্দুর কোথাও নেই। কেমন মেঘ-মেঘ ছায়া-ছায়া ভাব।

এরপর বুলবুলি শুনতে পেলো একটানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। সে

শুনেছে সমুদ্রের কাছাকাছি এরকম আওয়াজ শোনা যায়। একেই বলে সমুদ্রের ডাক। জলের দিকে তাকিয়ে সে দেখল, নীল আর কালো জল হাত ধরাধরি করে ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে। বুলবুলির ভারি মজা লাগল। সে কোনদিন সমুদ্র দেখেনি। আজ দেখবে। কিন্তু হঠাৎ গোঁ-গোঁ শব্দটা প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। জাহাজটা ভীষণভাবে দুলে উঠল। বড়বড় নীল-নীল কালো-কালো ঢেউগুলো রাক্ষসের মতো জাহাজটার দিকে ছুটে আসতে লাগল। সেই মুহূর্তে সে আকাশ-পাতাল সব দেখল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বন-বন করে ঘুরছে, ওলট-পালট খাচ্ছে। সে আতংকে চীৎকার করে উঠল।

মা ছুটে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, বুলি কি হয়েছে, বড্ড যন্ত্রণা করছে!

বুলবুলি ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না মা। এতক্ষণ জাহাজের স্বপ্ন দেখছিলাম।



বুড়ির পোশাক

মাকড়সা বুড়ি থাকে সাম্পানদের ছাতের চিলেকোঠায়। পোকাদের পোশাক-আশাকের ব্যাপারে তার খুব নাম-ডাক। সবরকম পোশাকই তার কাছে পাওয়া যায়। মজুরি বাবদ সে খুব বেশি কিছু চায় না। পোকাদের একটা করে ছানা পেলেই হল। ব্যাস্, পোকাদেরও এতে কোন আপত্তি নেই। ছানায় ছানায় তাদের ঘর ভরা।

সাম্পানদের বাড়ির বাগানের পেছন দিকে একটা গোয়াল ঘর আছে। সেখানে থাকে এক গুবরে আর গুবরী পোকা। বেশ পুরনো বাসিন্দাই বলতে গেলে।

তাদের আগে সুখ ছিল না। এখন বেশ সুখ। কেননা গুবরীটা এই গত শরৎকালে চারটে ডিম পেড়েছে। তারপর শীতকালে ডিম থেকে তার চারটে ছানা হয়েছে। তার মধ্যে একটা আবার ছানী। তাই তাদের মনে এখন ভীষণ সুখ--ভীষণ মজা।

এইভাবে কেটে যায় দিন। দিন কেটে মাস, মাস কেটে বছর। এমন সময় একদিন গুবরীটার খেয়াল হয়—ছানীটা তো বড়ো হয়েছে। বড়ো হলেই বিয়ে দিতে হয়। জামাই আনতে হয় ঘরে। কিন্তু জামাই আনতে গেলে তো অনেক ঝক্কি—অনেক ঝামেলা—অনেক ভাবনা —অনেক চিন্তা। গুবরী একা একা এতো ভাবতে পারে না। তখন গুবরেকে ডাকে গুবরী।

গুবরীর ডাকে আসে গুবরে, বলে, কি হল! এত চেঁচামেচি কিসের?

—কি আর হবে? আমাদের ছানী যে বড়ো হয়েছে। সে খেয়াল আছে তোমার? এবার ওর বিয়ে দিতে হবে যে! গুবরী বলে।

—তাই নাকি? গুবরে আনন্দে এক পাক বোঁ করে ঘুরে এসে

বলে, ছানী বড়ো হয়েছে, ওর বিয়ে দিতে হবে, কি মজা !

একদিন সন্ধ্যের পর গুবরে ছানীটাকে ডেকে পাঠায়। সে তখন ছানা-ভাইদের সঙ্গে খেলা করছিল। বাবার ডাক শুনে দৌড়ে আসে। গুবরে ছানীটাকে দেখে বুঝল, গুবরীটা তো ঠিকই বলেছে! এবার সত্যি সত্যি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় নেমে আসে মহা দুশ্চিন্তা। সুপাত্র পাওয়া যায় কোথায় ?

সুপাত্রের খোঁজ করতে করতে তার দেখা মেলে রায়দের বাগানে। একটা বড়ো আমগাছের গুঁড়ির গায় তার বাসা। মা-বাপের এক ছেলে। ঘরও বেশ বনেদী। বরও বেশ দেখতে-শুনতে। গুবরে বিয়ের পাকা কথা দিয়ে আসে।

সে বাড়িতে ফিরে ছানাটাকে নিয়ে খুব আদর করে। বড়ো আদরের মেয়েটা। এবার ঘর অন্ধকার করে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু মেয়েকে আদর করলেই তো আর চলে না। সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন অনেক কাজ বাকি। তাই গুবরে ডাকে গুবরীকে, গুবরী ডাকে ছানাদের। সবাই মিলে শলা করে। বিয়েতে কি কি চাই ?

চাই পাতার পাল্কী। ঝিঁঝি-র বাজনা। গন্ধী পোকার আতরও চাই—আর চাই জোনাকি পোকার আলো। সবচেয়ে বেশি চাই মাকড়সা বুড়ির তৈরি ঝলমলে পোশাক। এ সবেরই ব্যবস্থা করতে হবে এখন। তাছাড়া কিছু পোকা পাড়া-পড়শিদেরও বলতে হয়—নয়তো ভাল দেখাবে না। কিছু আত্মীয়-কুটুমকেও জানাতে হয়—নইলে নিন্দে-মন্দ হবে যে! গুবরে বলে, আমি আগে চলে যাই মাকড়সা বুড়ির কাছে। কাপড়ের বরাত দিয়ে আসি। গুবরী, তুমি যাও গন্ধী পোকার কাছে আগে। তারপরে যেও জোনাকি পোকাদের বলতে। ছানারা যাক পিঁপড়ে বাহকদের খবর দিতে। ওরাই বরকে পাতার পাল্কীতে করে নিয়ে আসবে। তারপর সবাই মিলে যাব পাড়া-পড়শি আর আত্মীয়-কুটুমদের কাছে।

যে যার কাজে বেরিয়ে যায়। গুবরে স্যাঁৎ করে উড়ে উঠে পড়ে

সাম্পানদের ছাদের চিলেকোঠায়। সেখানে মাকড়সা বুড়ি বসে বসে কেবলই পোশাক তৈরি করছে। গুবরে বলে মাকড়সা বুড়ি, আমার ছানীর বিয়ে।

মাকড়সা বুড়ি মুচকি হেসে জবাব দেয়, ওমা, তাই নাকি—তাই নাকি! তা কবে বিয়ে?

—গুবরে বলে, আসছে চাঁদের পরে যে আঁধার রাত সেই রাতে বিয়ে।

—তা বেশ, তা বেশ! মাকড়সা বুড়ি তার হাত নাড়িয়ে বলে।

—ভালো ভালো পোশাক চাইগো! গুবরে খুশিতে ঝকঝক করে ওঠে।

—তা বেশ, তা বেশ! কাপড় বুনতে বুনতেই মাকড়সা বুড়ি জবাব দেয়!—আমার মজুরি তো তোমাদের জানাই আছে। ওটা আগেভাগেই চাই কিন্তু।

গুবরে এবার কেঁপে ওঠে। মজুরি! মজুরি মানেই তো একটা ছানা দিতে হবে মাকড়সা বুড়িকে। বিয়ের আগেই একটা ছানা।

গুবরে কাঁদো কাঁদো গলায় মিনতি করে, বিয়ের আগেই কি না দিলে নয়, বুড়ি! হাজার হোক বোনের বিয়েতে ভাইদের একজন থাকবে না—তাও কি হয়?

মাকড়সা বুড়ি চুপচাপ পোশাক তৈরি করে চলে।

গুবরে ভাবে, বুড়ি তার কথায় বুঝি রাজি। যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল একটা ব্যাপারে। সে খুশিতে ডগোমগো হয়ে বলে, এবার আমি আসি গো বুড়ি।

বুড়ি চুপচাপ পোশাক তৈরি করে চলে।

ধীরে ধীরে বড়ো চাঁদের রাত পেরিয়ে আসে আঁধার রাত। গুবরে গুবরীর বাড়িতে হৈ-চৈ। জোনাকি পোকারা এসে ঘর-দোর আলোয় আলো করে দিয়েছে। সন্ধ্যে রাত থেকেই ঝিঁঝি পোকারা বাজনা বাজাতে বসে গেছে। গন্ধী পোকারা বাড়িময় এমন আতর

ছড়িয়েছে যে, সাম্পানদের সারা বাগান গন্ধে গন্ধে ম ম। আর পাড়ার মাথা কাট্ঠে পোকা সদরে বসে সব দিক তদারকি করছে।

কেবল গুবরেকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। মাঝে মধ্যে গুবরী ঘর-বার করছে। ছানারা সব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তখন।

বর আসার সময় হয়ে আসে। গুবরে এখনও আসে না কেন, গুবরী ভাবে। সেই ভর বিকেলে গেল পোশাক আনতে, সন্ধ্যে কাবার। একে একে পাড়া-পড়শি-আত্মীয়-কুটুম সব এসে পড়ে। তারা গুবরের খোঁজ করে। গুবরী বলে, একটা কাজে গেছে—এই এলো বলে।

সময় এগিয়ে যায়। সন্ধ্যে উতরে রাত হয়। বর আসে আসে। গুবরী আর চুপ করে থাকতে পারে না। ছানাদের ডাকে, দেখতো বাছারা, তোমাদের বাবা পোশাক আনতে গেল, এখনও আসে না কেন?

—মাকড়সা বুড়ির কাছে তো! এখুনি যাচ্ছি আমরা।

ছানারা স্যাঁত করে উড়ে যায় সাম্পানদের চিলেকোঠায়। কিন্তু সময় বয়ে যায় অনেক। ওরাও ফিরে আসে না।

এদিকে পিঁপড়ে বাহকদের পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। পাতার পালকীতে চড়ে এ বুঝি বর আসে। ঠিক সেই সময়ে গুবরী ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। সেই কান্নায় ঝিঁঝিরা বাজনা বন্ধ করে। জোনাকিরা দেয় আলো নিভিয়ে। সারা বাড়ি বাগান ছুটে আসে গুবরীর কাছে। এই শুভকাজে অলুক্ষুণে কান্না কেন? সকলেই হুমড়ি খেয়ে জিজ্ঞাসা করে গুবরীকে।

গুবরী কাঁদতে কাঁদতে জানায় পোশাকের কথা, গুবরে আর ছানাদের কথা!

—নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। কাট্ঠে পোকা গম্ভীর গলায় কট্‌কট্ করে বলে।

ততক্ষণে পাতার পালকী থেকে বর নামে। শোনে সব কথা।

শেষমেষ বলে, হাত-পা গুটিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকলে তো চলবে না। একটা কিছু করতেই হবে।

—কিন্তু কি করবে বাবা! কাঁদতে কাঁদতে বলে গুবরী।

দল বেঁধে আমাদের সেখানে যেতে হবে। দেখতে হবে ব্যাপারটা কী? ছানীর বর বেশ শক্ত গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করে।

পাড়ার মাথা কাট্ঠু পোকা বলে, বেশ তাই হোক! চলো সবাই একসাথে।

ঘরের মধ্যে ছিল ছানী। এতক্ষণ শুনছিল সব কথা! তার চোখ-মুখও শক্ত হয়ে ওঠে। সে দৌড়ে এসে দাঁড়ায় মা-র পাশে। বলে, আমিও যাব সবার সাথে।

গুবরে আর ছানাদের খোঁজে সবাই সার বেঁধে এগোয়। বর আর বরের সঙ্গে এসেছিল যত যাত্রী তারা সকলের আগে। ঝিঁঝি পোকারা বাজনা বাজাতে বাজাতে চলে তারপরে। জোনাকি পোকারা আবার জ্বালায় আলোর রোশনাই। কাট্ঠু পোকা চলে সব দিক তদারকি করতে করতে। পাড়া-পড়শি-আত্মীয়-কুটুম সব সার বেঁধে চলে ওই দলে।

সাম্পানদের ছাদে সেই আঁধার রাতে পোকাদের মিছিল ওঠে। ঝিঁঝি-র বাজনা বাজে। জোনাকি পোকার আলোর রোশনাই জ্বলে।

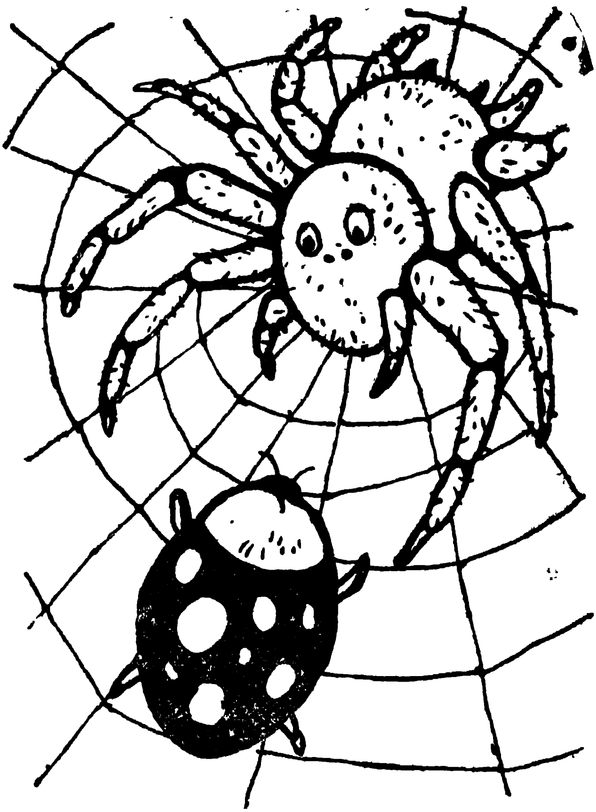
চিলেকোঠা! চিলেকোঠা!—গোটা দলটা চেঁচায়। তখন কোঠার মধ্যে মাকড়সা বুড়ি নড়ে-চড়ে বসে।

সবার আগে স্যাঁত করে ঢুকে পড়ে ছানী ওই চিলেকোঠার মধ্যে। ওইতো আমার বাবা মাকড়সা বুড়ির জালে। ডুক্‌রে ওঠে ছানী। গোটা দলটা হুড়মুড় করে ঢোকে চিলেকোঠার ভেতরে।

তখন মাকড়সা বুড়ি বলে, তোমরা সব দল বেঁধে এসেছো কেন বাছারা!

—তা কি তুমি জান না বুড়ি? গোটা দলটা চীৎকার করে ওঠে।

ওই গুবরে আর তার ছানাদের জন্যে তো। মাকড়সা বুড়ি কথা বলতে যেন হাঁপিয়ে পড়ে। একটু দম নিয়ে আবার বলে, তা এমন কি কথা! ওই তো গুবরে, ওকে নিয়ে যাও। আর বাছা ছানাদের আমি খেয়ে ফেলেছি।



এই কথা শুনে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে ছানী। ছানীর কান্না দেখে সব পোকাদের চোখ ভরে ওঠে জলে।

—তা কি করব বল? মাকড়সা বুড়ি বলে। —গুবরে তার কথা রাখতে পারেনি। পোশাক বানিয়েই তো আমার পেট চলে।

ঝিঝি-র বাজনা তার অনেক আগেই গেছে থেমে। কেবল জোনাকি পোকারা জ্বালিয়ে রেখেছে আলো।

এই অবস্থায় সবাই যখন চুপ, তখন কথা বলে ছানীর বর, গমগম করে।

—মাকড়সা বুড়ি তোমার নিয়ম আমরা জানি। বাপ্-দাদারা মেনে নিয়েছিল তা। কিন্তু আমরা আর তা মানব না।

এবার কাট্‌ঠু পোকা এগিয়ে এসে কাটতে থাকে বুড়ির জাল। সেই জাল থেকে বেরিয়ে আসে গুবরে। আর তক্ষুণি সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাকড়সা বুড়ির ওপরে।

ঝিঁঝি-র বাজনা তখন বেজে ওঠে খুব জোরে জোরে।

বাঘেরা সব কোলকাতায়

সুন্দরবনের এক কেঁদো বাঘ তার প্রতিবেশী সেঁদো বাঘকে ডেকে বললে, না ভাই, আর এভাবে থাকা যায় না।

সেঁদো বন্ধুর কথা শুনে জিজ্ঞেস করলে, কেন ভাই ?

কেঁদো জবাব দিলে, আর বল কেন ! দিনের পর দিন বনের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে কি আর ভাল লাগে ! রাত দিন সবুজ আর সবুজ। মাঝে মাঝে অবশ্য ঝোপ-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঐ নদীতে জল খেতে যাই, দেখো, তাও কেমন ভয়ে ভয়ে। না ভাই, ঘেন্না ধরে গেল এই জীবনটাতে !

কথাটা সেঁদোর মনে লাগল। সেও তো তাই মনে মনে ভাবে। তাই বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে সেঁদো বললে, ঠিক ঠিক।

কেঁদো বাঘ আবার বললে, আমরা সেই পুরনোই রয়ে গেলাম। আর ওদিকে দেখো, মানুষগুলো কত পাল্টে গেল। আমরা কেবল হালুম আর হালুম শিখেছি। রোজ রোজ চুপিসারে শিকারের খোঁজে যাই, যাহোক একটা হরিণ বা ধেড়ে শুয়োর মুখে নিয়ে ফিরে আসি। কোনদিন যদি শিকারে মানুষ পাওয়া গেলো তো মোচ্ছব। ব্যস্... ! আর কি আছে আমাদের জীবনে বল ?

সেঁদো এবার বেজার মুখে বললে, তাই তো !

কেঁদো বেশ উৎসাহ পেয়ে গেল। তার মনের ক্ষোভগুলো বন্ধুর কাছে তুলে ধরলো—আমাদের কি একবার সিনেমা দেখবার ইচ্ছে হয় না ? এই তো সেদিন ডোরাকাটা ঝোপে বসেছিলাম শিকার পড়বে বলে। ওমা, পড় তো পড় একেবারে মানুষ শিকার। কিন্তু শিকার ধরবো কি, মানুষগুলো কেমন সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে বন্দুক নাড়িয়ে

মেজাজে সিনেমার গল্প বলতে বলতে যাচ্ছিল। মজাটা কি, সেই সিনেমাটা আবার আমাদের বিষয় নিয়ে!

সেঁদো হঠাৎ বলে উঠলো, তুমি ওদের ভাষা বুঝলে কেমন করে ভাই?

কেঁদো বিরক্তিতে গোঁফটা চুমড়ে বললে, আহা-হা তুমি জানো না, ছেলেবেলায় আমি একটা সার্কাস দলে ছিলাম। তারপর সেই সার্কাসওয়ালার বাচ্চা ছেলেটাকে ঘায়েল করে সট্‌কে পড়লাম।

সেঁদো বলে ফেললে, আহা-হা, তুমি এমন নিষ্ঠুর ভাই!

কেঁদো বিরক্তিতে আরো একবার গোঁফ চুমড়ে বললে, ওরা কি কম নিষ্ঠুর? যাক, সে সব কথা তুমি বুঝবে না। ভুক্তভোগীর ব্যথা অন্যকে বোঝানো দায়। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম, আমি তো হাঁ করে শুনতে লাগলাম ওদের গল্প। তারপর যখন ওরা চলে গেল অনেক দূর, গল্পটাও আর শোনা যায় না, তখন নিলাম পেছু। আর অমনি হঠাৎ একটা লোক পেছন ফিরে তুম্ করে ছুঁড়ে মারলো একটা গুলি। কেমন বে-আক্কেলে দেখো—গিয়েছিলাম আর কি! ঝট করে এক লাফে পাশের ঝোপটায় লাফিয়ে পড়ে দে ছুট। কানের পাশ দিয়ে গুলিটা ধাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সেঁদো মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বললে, বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছ।

—বাঁচা বলে বাঁচা। আমার সব সাধ-আহ্লাদ গেছিল আর কি! কেঁদো একটু চুপ করে বললে, চল ভাই সেঁদো, আজ রয়েলদার কাছে যাই। মাতলা নদী পেরিয়ে ক্যানিং হয়ে আমরা কোলকাতায় যাব। সিনেমা হলে ছবি দেখবো। গড়ের মাঠে হাওয়া খাবো।

সেঁদো বন্ধু কেঁদোর কথায় বেশ উৎসাহ পেয়ে নিজের হাতে একটা চাঁটি দিয়ে বললে, বেশ চল। আজই বলবো রয়েলদাকে।

সেদিন বিকেলেই রয়েলদার বাড়িতে দুই বন্ধু হাজির। রয়েল বৌদি তখন তার বাচ্চাটাকে কচি কচি ঘাস খাওয়াচ্ছিল। তাই দেখে দুই বন্ধু বলে উঠলো, একি বৌদি, করছেন কি?

বৌদি কাঁদো কাঁদো সুরে বললে, আর বল কেন, তোমার দাদা বেরিয়েছেন সেই সাত-সকালে। বিকেল গড়িয়ে চললো, তার ফেরার নাম নেই। গতকাল একটা বাচ্চা খরগোশ নিয়ে এসেছিল সেই সন্ধ্যের পর। তা দিয়ে আজ কোনরকমে চালিয়েছি! আমাদের না হয় কষ্টে সিষ্টে চলে, কিন্তু বাচ্চুর পেট তো আর মানে না। তোমার দাদা বলেন, যা দিনকাল পড়েছে, তাতে শিকার মেলা ভার।

বাচ্চাটার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে কুড় কুড় করে ওদের কাছে এসে খেলতে লেগে গেল। রয়েল বৌদি বললে, তোমরা বস ভাই, উনি এখুনি আসবেন।

কেঁদো আর সেঁদো বাচ্চুটার সঙ্গে যখন হুটোপুটি খেলে হাত চাটতে চাটতে বিশ্রাম করছে, এমন সময় ঝোপড়ার বাইরে থেকে ঘর্‌র ঘর্‌র আওয়াজ এল। রয়েল বৌদি বললে, ওই তোমাদের দাদা এসেছেন, বোধহয় কিছু খাবার আজ পেয়েছেন, তাই অমন খুশীর আওয়াজ দিচ্ছেন।

কথা শেষ না হতেই রয়েলদা ঝোপড়ার ভেতর ঢুকে পড়ল। বৌদির সামনে তিনটে ধেড়ে খরগোশ রেখে পিছন ফিরে 'হালুম' শব্দ করে বললে—তোমরা কি মনে করে?

কেঁদো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে দাদা।

দাদা আজ মেজাজেই ছিলেন, তাই একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন, তার আগে একটু ফলার হোক। বৌদিকে বললেন, দাও, ওই একটা খরগোশ আমাদের মধ্যে চেলে দাও।

রয়েল বৌদি একটা খরগোশ তিনজনের মধ্যে দিয়ে বাচ্চুকে নিয়ে চলে গেলো পাশের গর্তটায়। রয়েলদা খরগোশটার মাথাটা মুখে পুরে কুড়মুড় করে চিবুতে চিবুতে বললেন, বাকিটা তোমরা ভাগ করে খাও। খাসা মাংস!

কেঁদো সেঁদো ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে বললে, তা যা বলেছ।

মিনিট দু'তিনের মধ্যে খরগোশটার আর কোন চিহ্নই পাওয়া গেলো না। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত যা পড়েছিল তাও তিনজনে চেটে-পুটে সাফ করে ফেলল। তারপর একটু গলা ঝাড়া দিয়ে তিনজনে ঠিক হয়ে বসলো। রয়েলদা আর একটা খোসমেজাজে হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন, নাও, কি পরামর্শ চাই বল।

কেঁদো তখন একটু কেশে একটু ঘেমে বলতে আরম্ভ করলো, যার তার কাছে তো আর বলছে না। তামাম সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল ডোরাকাটা কেঁদো-সেঁদো সব বাঘের গুরু। তার একটা আদেশ মানে বেদবাক্য। তাই গুরুতর কথাটা বলতে সে একটু ঘেমে উঠবে বৈকি। একবার সেঁদোর দিকে চাইলে তারপর বললে, এই বলছিলাম আর কি—আজকাল শিকার-টিকারের যা অবস্থা, তারপর এই বন্দী জীবন—

কে বলে আমরা বন্দী? হুংকার দিয়ে রয়েলদা জিজ্ঞাসা করল।

না, আর কেউ বলেনি। এই আমরাই বলছিলাম আর কি—একটু ঢোক গিলে নিয়ে কেঁদো বললো, আমাদের এখানে দিন-রাত খালি বন আর বন। মাঝে মধ্যে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেলে ওই মাতলায় গিয়ে জল খাই, ব্যস। তখন যা একটু ঝকমকে রোদ্দুর কিংবা ফুটফুটে জ্যোৎস্না নজরে পড়ে। তাছাড়া আর কি বল?

রয়েলদা কেঁদোর কথা শুনে একটু ভাবলে। তারপর বললে, হুম, তা বলেছ বটে। এ রকমটা আমারও মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে একটু বেড়ানো-টেড়ানো ভালো। শরীর আর মন দুয়েরই উপকার হয়।

কেঁদো রয়েলদার কথায় বেশ উৎসাহ পেয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি চিঁড়ে ভিজবে ভাবতে পারেনি। তাই ডগমগ গলায় বললে, মানুষ বেড়াতে যায় শহর থেকে বনে, আমরা বন থেকে যাব শহরে।

রয়েলদা বললে, তা এ প্রস্তাবটা মন্দ নয়। দু'চার দিনের জন্যে একবার শহরে ঘুরে আসা যেতে পারে। কি বল হে! প্রতিবেশী সেঁদোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রয়েলদা।

প্রতিবেশী সেঁদো মাথাটা নাড়িয়ে দিয়ে বেশ বিজ্ঞের মতো বললে, তবে একটা অসুবিধে আছে দাদা। মানুষগুলো বড় বিপজ্জনক। আমাদের সেই ভেঁদো বাঘ কি করে যেন কলকাতার গড়ের মাঠে চলে গিয়েছিল—ব্যস, ওরা ওকে ধরে বেঁধে একেবারে সোজা চিড়িয়াখানায় আটকে দিলে। খবর পেয়ে এখানে ওর ছেলেমেয়ে বৌয়ের কি কান্না, কি কান্না! বলতে বলতে সেঁদোর চোখটাই একটু ছলছল করে উঠল। কেঁদো বললে, তা ভাই ওরা ধর্ম মেনেছে। গুলিটুলি করে বসেনি।

সেঁদো সেদিনের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না।

রয়েলদা অতশত বুঝলো না, কথাটা শুনে একটু চটে উঠে বললে, রাখো ঐ ভেঁদোর কথা। ওর গুলি খাওয়াই ভালো ছিল। ব্যাটা শেষে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে চিড়িয়াখানায় রূপ দেখাচ্ছে। কয়েকটা মানুষ শেষ করে আত্মহত্যা করতে পারল না? ব্যাটা ব্যাঘ্র জাতির কলঙ্ক!

রয়েলদা চটে গেলে কোন কথা নয়। কিসে কি হয় কে জানে।

অনেকক্ষণ গুম মেরে থেকে রাগটা হজম করে রয়েলদা বললেন, আমরা যদি দল বেঁধে কোলকাতায় গিয়ে হাজির হই, তবে কোন্ মানুষের বুকের পাটা আছে, আমাদের আটক করে বা ঘায়েল করে?

ওরা দুজন তখন সাহস পেয়ে সমস্বরে বললে, কোন মানুষের নেই। আমরা কি যে-সে বনের বাঘ?

রয়েলদা বললে, তা ঠিক। তবে আজই আমার ফর্মান নিয়ে যাও, সকলকে জানিয়ে দাও—পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে সভা হবে। সব বাঘ মা-ভাই-বোনদের হাজির থাকা চাই।

ওরা দুই বন্ধু মাথা নামিয়ে টপ করে একটা প্রণাম সেরে রয়েলদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত কেটে গিয়ে এল সেই পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া জ্যোৎস্না রাত। মাতলার চরে কাতারে কাতারে সব বাঘের দল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে জমায়েত হল। যথাসময়ে ভিড় ঠেলে রয়েলদা

এল বৌদি আর বাচ্চাকে নিয়ে। বনের ধারে একটা বালির ঢিবির ওপর লেজ ছড়িয়ে উঠে বসল। তারই নীচে বসল রয়েল-বৌদি আর বাচ্চু। তার নীচে বসল কেঁদো আর সেঁদো। তার নীচে বসল বাঘের দল। সভা শুরু হয়ে গেল!



আমার বাঘ বন্ধুগণ,—রয়েলদা উঠে বলতে শুরু করে দিলেন। আজ আপনারা সবাই এখানে হাজির হয়েছেন,—আপনাদের সামনে আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। আমরা দিনের পর দিন এই বনে

কাটিয়ে বুঝতে পারছি যে, আমাদের জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গেছে। তাই একটা ভ্রমণের একান্তই দরকার। আপনাদেরই বন্ধু কেঁদো-সেঁদো একটি জায়গার নামও আমায় জানিয়েছে। ইদানীং সে জায়গাটি সব দিক দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের জায়গা হয়ে উঠেছে। সে জায়গার নাম হল কোলকাতা।

কোলকাতা—বলার সঙ্গে সঙ্গে সভায় একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। রয়েলদা একটা হুংকার দিয়ে বললেন, আপনারা শান্ত হোন।

সবাই শান্ত হল। রয়েলদা বলতে শুরু করলেন, হ্যাঁ, কোলকাতা ভ্রমণের প্রস্তাব আপনাদের সামনে রাখছি। আমরা সেখানে যাব, সিনেমা দেখবো, গড়ের মাঠে ঘুরবো-ফিরবো। আর যদি কেউ চান তো ট্রামে-বাসে চেপে হাওড়ার পুলের ওপর দিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারেন।

রয়েলদার এই কথায় সবাই হৈ হৈ শব্দে আনন্দ করে উঠল।

আনন্দের আওয়াজ একটু কমলে রয়েলদা আবার বলতে লাগলেন, আমাদের জীবনে বনের সবুজ অসহ্য হয়ে উঠেছে। পাখির চেঁচামেচি আর ভালো লাগে না। রোজ রোজ হরিণ আর খরগোশে আমাদের আর রুচি নেই—তাই না?

সবাই চেঁচিয়ে বলল, হ্যাঁ তাই, আমাদের এসব অসহ্য।

রয়েলদা বললেন, তাই, আমরা দল বেঁধে ছেলেপুলে কাঁধে পিঠে নিয়ে এই সুন্দর বন ছেড়ে মাতলা নদী পার হয়ে কোলকাতা যাব।

আগামী পরশু দিন ভোরবেলাই আমরা রওনা হবো। আপনারা সবাই তৈরি হয়ে নিন। আর আজকের মতো সভা এখানেই শেষ।

সভা শেষ হয়ে গেল। সকলে মিলে কোলকাতা সম্পর্কে নানা আজগুবি চিন্তা করতে করতে ঘরে ফিরে গেল।

এরপর এল পরশু দিনের ভোরবেলা। কাতারে কাতারে বাঘের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল মাতলার বুকে। আর তাদের চাপে জল ফুলে ওপারে ক্যানিং-এর মাছের হাট গেল ভেসে। লোকজন সবাই 'বান' এসেছে 'বান' এসেছে বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটলো যে যেদিকে পারে। যেসব

লোক পালাতে পারলো না; তারা হাবুডুবু খেতে খেতে জল খেলো। জল খেয়ে তাদের পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে বাঘ মশাইরা তো সাঁতরে সাঁতরে এসে হাজির। হাতের কাছে যাকে পেলো টপাটপ পুরল মুখে।

এইভাবে তারা ভোরবেলাই বেশ তাজা মানুষের মাংস খেয়ে হাঁপিয়ে পড়ল। পেট ফুলে এমন হল যে, আর নড়তে-চড়তে পারা যায় না। তারা দেখলো সামনে একটা লম্বা ঘরের মতো কি দাঁড়িয়ে। লাফিয়ে তাতেই চড়ে বসল।

লম্বা ঘরের মতোটা ছিল মাছের ট্রেন। ওটা ছাড়ার সময় ছিল তখনই। ট্রেনটা সোজা যাবে শেয়ালদা। বাঘেরা তো অতসব জানে না। তারা যে যেমন ঘর পেয়েছে তাতেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ট্রেনটাও দিল হুইশিল বাজিয়ে ছেড়ে।

ওদিকে কলকাতার পুলিশ অফিসে খবর চলে গেল। পুলিশের বড় কর্তা তখনি হাজার হাজার বন্দুকধারী পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন।

গাড়ির পর গাড়ি বোঝাই হয়ে বন্দুকধারী পুলিশ চলে এল ক্যানিং-এ। তারা বন্দুক উঁচিয়ে খোঁজ করতে লাগল বাঘেদের। কিন্তু কোথায় বাঘ? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঘ পাওয়া গেল না।

ওদিকে বাঘেরা তো ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে উঠে বসল ট্রেনের মধ্যে। যে যার সিটে বসেই জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে দিল বাইরে। ওঃ, আশে-পাশে কি বিচ্ছিরি দৃশ্য। ভাঙা বাড়ি, কাঁচা নর্দমা। ছোঃ, ছোঃ! কী বোঁটকা গন্ধ ভেসে আসছে। কয়েকটা বাঘ তো বমি করেই ফেলল। একজন বলল, কোলকাতাটা এত নোংরা। আচ্ছা ভাই কোলকাতায় আকাশ কোথায়? আকাশ।

আরেকজন বললো, একি তোর সোঁদরবন যে, আকাশ পাবি?

কেউ কেউ মন খারাপ করল। চুপ মেরে ওই সব ছাইপাঁশ দৃশ্য দেখতে লাগল। রেল লাইনের পাশে যেসব মাঠ আর বাড়ি ছিল সেখান থেকে ছেলেরা দেখল গাড়ি ভর্তি এসব কি? কয়েকটি ছেলে

তো 'ওমা বাঘ' বলেই ভিরমি খেলো। কয়েকটি চালাক-চতুর ছেলে বললে, আরে না। বাঘ কি রেলগাড়ি করে যায় নাকি? ও সব বহুরূপী। বাঘের মুখোশ পরে কলকাতায় যাচ্ছে। মেলা হচ্ছে না শেয়ালদায়!

ধীরে ধীরে ট্রেন শেয়ালদার প্ল্যাটফরমে ঢুকল। তারপর ঘটাং করে থেমে গেল। প্ল্যাটফরমটা লোকে লোকে ভিড়। যারা ক্যানিং যাবে বলে উঠতে এল গাড়িটায়, তারা বাঘ দেখেই দে দৌড়!

তাদের দৌড় দেখে অন্য লোকেরাও দিল দৌড়। প্ল্যাটফরম ফাঁকা।

রয়েলদা ছিলেন একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। তিনি লাফ দিয়ে নেমে হুংকার ছাড়লেন। পিলপিল করে নেমে এল সব বাঘ। বাঘে বাঘে প্ল্যাটফরম ভর্তি। সে এক এলাহি কাণ্ড! যেন বাঘের মেলা। তারপর শুরু হল যাত্রা।

দলে দলে বাঘ এসে ভিড় করল শেয়ালদার মোড়ে। এদিকে লোকজন সব ফাঁকা। বাঘের খবর পেয়ে যে যেদিকে পেরেছে ছুটেছে। ট্রাম-বাস কিন্তু তখনো রাস্তায় চলছিল। বাঘেরা তো ট্রাম-বাস দেখে বিকট শব্দ শুনে গেল ঘাবড়ে। ঘাবড়ে গিয়ে যে যেটাতে পারল চেপে বসল।

একদল চলে গেল হাওড়ায়। সেখানে আরো বেশি ট্রাম-বাস আর মানুষ দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারা ছোটাছুটি করতে করতে স্টেশনের মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলো ট্রেনের একটায় হুড়মুড় করে উঠে বসল। আর এমন মজা, ওরা উঠে বসতেই ট্রেনটা দিলে ছেড়ে। হায় হায়, ট্রেনটা যে কোলকাতা ছেড়ে চলল! যখন তাদের খেয়াল হল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল যে, সারি সারি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ঝমঝম শব্দে ছুটছে। আর দেরি না করে পড়ি-মরি করে দিল এক লাফ। নাঃ! আর কোলকাতা নয়, বাব্বাঃ। আমাদের জঙ্গলই ভাল।

অন্য যে সব বাঘ ধর্মতলার ট্রামে-বাসে চেপে যাচ্ছিল, তারা দেখল

একটা সিনেমার পাশে তাদের ছবি টাঙানো। দেখামাত্রই এক লাফে সেখানে গিয়ে ভিড় করল। একদল চৌরঙ্গিতে একটা ভাল দোকানের সামনে গিয়ে নামলো। সে-দোকানে ভাজা হচ্ছিল মোগলাই পরটা। তাদের দেখে যারা পরটা ভাজছিল তারা দিল দৌড়। বাঘেরা তো নিশ্চিন্ত মনে উনুনের উপর গরম চাটু থেকে যেই না গেছে মোগলাই পরটা খেতে, আর সংগে সংগে গরম ছ্যাঁকা লেগে জিভ গেল পুড়ে, গোঁফ গেল ছাই হয়ে।

নমস্কার বাবা মোগলাই পরটা – এই বলে তারা বেরিয়ে পড়ল গড়ের মাঠেব দিকে। যারা গিয়েছিল সিনেমা দেখতে, তারা হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে মাঠের ঠাণ্ডা বাতাস আর উপরের নীল আকাশের দিকে তাকাতে লাগলো।

এমনি সময় চারদিক থেকে কারা যেন বিরাট জাল দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল। তারা দেখল কাতারে কাতারে সব বন্দুক আর লোহাব টুপিপরা মানুষ।

বাঘেরা এইসব দেখে বোকা বোকা চোখে তাদের নিজেদের দিকে তাকাল। দু'চারজন খুঁজলো তাঁদের নেতা রয়েলদাকে। কিন্তু কোথায় রয়েলদা। চারদিকে অগুন্তি বাঘের ভিড়।

অগত্যা, কী আর করা? তারা চুপচাপ সার বেঁধে একটা লোহার খাঁচার গাড়িতে ঢুকে ভেড়ার ঠ্যাং চিবুতে বসল। তবে, তাদের চোখ-মুখ দেখে মনে হল, এ অবস্থা তারা কিছুতেই মেনে নেবে না। আপাততঃ চুপচাপ থাকা যাক।

পরের দিন ভোরের খবরের কাগজে দেখা গেল বড় বড হরফে ছাপা—

বাঘেরা সব কোলকাতায়

নাফা শাক আর হাতি

এক গ্রামে বাস করতো এক সাদাসিধে বুড়ো। সে ছিল খুব গরীব। কিন্তু তাই বলে তার দুঃখ-টুঃখ ছিল না কোন। সে কয়েক বিঘা জমি জুড়ে নাফা শাকের চাষ করত। সেই শাক তার দেশের লোকের খুব পছন্দ ছিল। তাই সে হাটে হাটে বিক্রী করে দিন চালাত কোনরকমে। একদিন সেই বুড়ো ভোরে উঠে ক্ষেতে গেছে শাক তুলতে। কিন্তু সে দেখে অবাক কাণ্ড। এই ষাট বছরে যা হয়নি। কে যেন তার ক্ষেত থেকে শাক তুলে নিয়ে গেছে। বুড়ো হায় হায় করে উঠলো। কে করল তার সঙ্গে এমন শত্রুতা। সে তো কখনো কারো পাকা ধানে মই দেয়নি। আর তাছাড়া, গ্রামে তো এমন কু-স্বভাবের লোক নেই কোন! তবে?

বুড়ো ভাল করে ক্ষেত পরীক্ষা করে, আর ভাবতে থাকে। হঠাৎ সে দেখে, উদুখলের গোল গোল পায়ের ছাপ ক্ষেতের মধ্যে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। তাহলে কি উদুখলটার কম্ম? সাদা লোক বুড়ো, তাই তার ভাবনাটাও সিধে। ক্ষেত ছেড়ে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে। না, উদুখলটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কে জানে কি হল। দানোটানোর কথা বলা যায় না। যদি ওতে ভর করে থাকে! তাই সে পাটের রশি দিয়ে কষে ঐ উদুখলটাকে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে রাত হল। রাত গড়িয়ে সকাল। বুড়ো আবার গেল ক্ষেত দেখতে। হ্যাঁ, সেদিনও ক্ষেতের শাক কমে গেছে অনেকটা। বুড়ো ডুকরে কেঁদে উঠলো ক্ষেতের মধ্যে।

কিন্তু কেঁদে কি করবে। ব্যাপারটা দেখতে হবে। নিজের চোখে দেখতে হবে কোন্ ডাকুর এই কম্ম, সেদিন রাতে বুড়ো লাঠি নিয়ে ক্ষেতে গিয়ে বসল পাহারায়।

জোছনা রাত। হলফল করছে ক্ষেত নীল আলোয়। একটা পেঁচা ডেকে ডেকে ক্ষেতের উপর দিয়ে উড়ে গেল। বুড়োর হাই উঠল একটা। একটু ঝিমুনির মতোও।

হঠাৎ শুনতে পায় খচমচ করে কে যেন শাক কাটছে। বুড়ো ঝিমুনি কাটিয়ে চোখ মেলে চায়। হাই বাপ! একি কাণ্ড! একটা সাদা হাতি ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর দূরে এক দেবদূতের মতো মানুষ উবু হয়ে শাক তুলছে। বুড়ো এখন কি করবে! সে আওয়াজ করতেও ভুলে গেল। দেবদূতের মতো মানুষটা শাক তুলে হাতির পিঠে চাপাল। হাতিকে কি যেন বলে তার উপর চড়ে বসল। হাতিটা দুটো ডানা মেলে উড়ল আকাশে। বুড়ো আকাশপানে তাকিয়ে দেখল। হাতিটা উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল কোথায়।

বুড়ো স্বপ্ন দেখল নাকি! সে চোখ কচলালো দুই হাতে। সামনে নাফা শাকের ক্ষেতটা জোছনায় হলফল করছে! ক্রমে সকাল হল। অনেক পাখি ডাকল। হাই তুলতে তুলতে বুড়ো ক্ষেত থেকে বাড়ি এলো। ঘরে এসে সে ভাবতে বসল, এখন কি করবে? কথাটা কাউকে জানাবে! না, কোথা থেকে কি হবে কে জানে! বুড়ো ভাবতে থাকে। থৈ পায় না কিছুই।

কিছু খেয়ে বুড়ো একটু গড়িয়ে নিল। সেই সময় সে স্বপ্ন দেখল, সে হাতির লেজ ধরে ওপরে অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙতেই বুড়োর স্বপ্নের কথাটা মনে পড়লো এবং সেদিন রাত্তিরে আবার নাফা ক্ষেতে গিয়ে সেই হাতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

যথাসময়ে সাদা হাতি ডানা মেলে আকাশ থেকে তার ক্ষেতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বুড়ো গুটি গুটি করে হাতির ঠিক পেছনে এসে বসে রইল। হাতির উপর থেকে দেবদূতের মতো মানুষটি নেমে ক্ষেতের শাক তুলতে লাগল।

শাক তোলার কাজ শেষ করে সেই মানুষটি হাতির পিঠে চড়ে বসতেই হাতি পাখা মেলে দিল। ঠিক তক্ষুণি বুড়ো দৌড়ে গিয়ে হাতির লেজটা জোরে ধরল চেপে। হাতি উড়ল আকাশে আর বুড়ো হাতির লেজ ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলল।



এক সময়ে হাতি এসে থামল এক বিরাট প্রাসাদে। কোথাও কোন লোকজন নেই। হাতির পিঠে-বসা মানুষটি নাফা শাকগুলো

নিয়ে কোথায় চলে গেল। তার দিকে নজর পড়ল না কারুর। বুড়ো চুপটি করে হাতির পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালেন রাজমুকুটপরা সুন্দর এক পুরুষ। তিনি বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, কি চাও তুমি এখানে?

বুড়ো চটপট জবাব দিল, আমার নাফা শাক।

সেই পুরুষ বললেন, ও! কিন্তু সেই শাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তা তুমি পাবে না। আচ্ছা তার বদলে তুমি বরং অন্য জিনিস নিয়ে যাও।

এই কথা বলে সুন্দর পুরুষটি কোথায় চলে গেলেন। খানিক পরে একটা থলি এনে বুড়োর হাতে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে যা আছে তা তুমি ভেঙ্গেচুরে খাবে। এখন চলে যাও। রাত বড়ো বেশী বাকি নেই আর। তখন তিনি সেই সাদা হাতিকে হুকুম করলেন বুড়োকে নামিয়ে দিয়ে আসতে।

বুড়োকে নীচে নামিয়ে দিয়ে সাদা হাতি উড়ে চলে গেল আবার।

বুড়ো ঘরে এসে খানিক ঘুমিয়ে নিল। ঘুম থেকে উঠে তার খিদে পেল। তখন তার মনে পড়ল থলির ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে, তা ভেঙ্গে খাওয়া যাক। থলি খুলে দুটো একটা জিনিস বার করে ঢেঁকিতে ফেলে ভাঙ্গার চেষ্টা করল। না, জিনিসগুলো তো ভাঙ্গে না! তখন সে সেগুলো সেদ্ধ করে খাবার চেষ্টা করলো। দেখল, ওগুলো খাওয়া যায় না। আর কোন স্বাদ নেই। বুড়ো বুঝল, তাকে সাদাসিধে লোক পেয়ে সুন্দর পুরুষটা ঠকিয়ে দিয়েছে। ওটা নিশ্চয়ই পরীদের রাজ্য। আজ রাতেই আবার হাতির লেজ ধরে যেতে হবে ওখানে। বুড়ো তার নাফা শাকই ফেরত চাইবে। এইসব ভেবে বিরক্তির সঙ্গে অসিদ্ধ জিনিসগুলো ছুঁড়ে দিল ভাগাড়ে। তখন হল কি, সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এক সেয়ানা নাপিত। সে দেখছিল বুড়োর কাণ্ডকারখানা। তার ভারি কৌতূহল হল।

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ভাগাড়ে নেমে জিনিসগুলো পরখ

করতেই চমকে উঠল। বুড়ো করেছে কি! সোনা-দানাগুলো এমনি করে ফেলে গেল? ভারী দেমাক তো লোকটার! কবে ও এমন বড়লোক হয়ে উঠল! ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হয়। নাপিত তখন ভাগাড় থেকে জিনিসগুলো তুলে তার থলিতে ভরে ফেলল চটপট। তারপর ওখান থেকে উঠে বুড়োর বাড়ির ভেতর ঢুকল গলা খাঁকারি দিয়ে। বুড়ো তো নাপিত ভাইকে দেখে মনের বিরক্তি আর চাপা দিতে পারল না। বলে দিল সব ঘটনাটা।

নাপিতের হল লোভ। বোকা বুড়োর কাণ্ড দেখে সে তো মনে মনে হেসে আব বাঁচে না।

সেয়ানা নাপিত বুড়োর কাছে প্রস্তাব রাখলো। ব্যাপারটার একটা হেস্ত-নেস্ত করা দরকার। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ভাই ওখানে? বুড়ো বিরক্তির সঙ্গে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর কি এমন কথা। আজই রাতে এসো। আজ রাতেও ঐ ডাকু হাতিটা আসবে।

নাপিত ভায়া তো আহ্লাদে আটখানা। সেদিন কাউকে কিছু না বলে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে চলে এলো বুড়োর বাড়ি। বুড়োও তৈরী হয়েছিল ক্ষেতে যাবার জন্য। নাপিত ভায়ার চোখ দুটো তখন জ্বলজ্বল করছিল লোভে। সে ক্ষেতে যেতে যেতে বুড়োকে বলল, ওই ওখানে জিনিসগুলো চাইলে কতখানি দেবে? বুড়ো বললে, সে ঢের ঢের। যত তুমি নিতে পার।

ক্ষেতে এসে ওরা দুজন বসল চুপচাপ। নাপিতের তর সইছিল না আর। সে বুড়োকে বলল, কোথায় তোমার হাতি? বুড়ো জবাব দিল, আসবে আসবে।

আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে না করতেই সেই সাদা হাতি পাখনা মেলে ক্ষেতে এসে নামল। হাতি দেখেই নাপিতের চোখ দুটো লোভে আরও জ্বলে উঠল। সে ফিস ফিস করে বুড়োকে বলল, আচ্ছা জিনিসগুলো চাইলেই দেবেতো? বুড়ো উত্তর করলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। নাফা চোরের ওগুলো কোন দরকার নেই।

ওদিকে হাতির পিঠ থেকে সেই পুরুষটি নেমে নিঃশব্দে নাফাশাক তুলতে লাগল। বুড়ো তখন বলল, চল এই বেলা হাতির পেছনে চুপটি করে দাঁড়াই।

আমি ধরব হাতির লেজ, তুমি ধরবে আমার কোমর খুব শক্ত করে। লোভী নাপিত বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমি ধরব খুব শক্ত করে।

বুড়ো গিয়ে দাঁড়াল হাতির পেছনে লেজের কাছে। নাপিত দাঁড়াল বুড়োর ঠিক পেছনে কোমর ধরে। এরমধ্যে সময় হল হাতির উড়াল দেবার। সে দু'পাশে ডানা মেলে ধরল। তারপর ডানা ঝাপটে আকাশে উড়াল দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো হাতির লেজ ধরল ঝাপটে। হাতি উড়ল, বুড়ো উড়ল, আর কোমর ধরে ঝুলতে ঝুলতে উড়ল নাপিত।

উড়ছে ওরা সবাই। কেবল উড়ছে। নাপিতের আর তর সইছে না। ঘুরে ফিরে ওই কথাটা মাথায় ঘুরছে। যত চাইব ততই ওরা দেবে। আঃ, তবে কত বড়লোক হওয়া যাবে! ভাবতে ভাবতে নাপিতের আর দেরী সয় না। সে বুড়োকে জিজ্ঞাসা করল, ও বুড়ো, যত চাইব তত দেবে তো? বুড়ো জবাব দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। আবার নাপিত জিজ্ঞাসা করল, ওদের কতখানি আছে? বুড়ো বলল, ঢের ঢের।

নাপিত অধৈর্য হয়ে পড়ল। ঢের ঢের বললে তো বোঝা যায় না কিছু। ভাল করে বলই না বাপু। সাদাসিধে বুড়ো দু'হাত ছড়িয়ে বলতে গেল—এই এত। কিন্তু বলা আর হল না। লেজ ছেড়ে দিতেই তারা দু'জনেই পড়ে গেল নীচে। একেবারে নীচে।

শিবুরামের ডায়েরীতে শিব্রামদা

"আমি শিবুরাম—বারবার শিব্রামদার পাল্লায় পড়ে বোকারাম হই। তবু পড়ি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়ি। তবে তার পাল্লায় পড়লে মনটা আমার কেবল পালাই পালাই করে। কিন্তু পালাইয়ের আমার কোন বালাই জোটে না।

সেদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার বালাই জুটে গেল। সেটা একটা কাবুলির জন্য ঘটল। সেজন্য কাবুলিকে ধন্যবাদ।"

এরপর শিবুরাম সেদিনের কাহিনী তার ডায়েরীতে সবিস্তারে বিস্তার করল।

"রবিবার সকাল বেলা বাজারটা সেরে এসে হিসেবের খাতাটা দেখছিলুম। এমনি সময় শিব্রামদা এসে গদগদ স্বরে বললেন, চল হে শিবুরাম, তোমায় একটা ভোজ খাইয়ে নিয়ে আসি।

আমি হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম। তিনি আমার নাকটা নেড়ে দিয়ে বললেন, ভোরবেলা ইতু খবর দিয়ে গেল, নিকুঞ্জকাকা নাকি সন্ধ্যের গাড়ীতে ধানবাদ রওনা দেবেন। তাই টুম্পার মা একটা ভোজের ব্যবস্থা করেছে। আর তাতে তোমার আমার নেমন্তন্ন।

কথাটা শুনে আমার 'হাঁ' আরেকটু সাকার হল। তবুও মনের ভাব গোপন রেখে বললুম, আমায় কি করতে হবে?

শিব্রামদা এটুকুর জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন। বোমার মত ফেটে পড়লেন, ওহে হাঁদারাম তোমায় এবার তৈরী হতে হবে।

নেমন্তন্নর জন্য তো আমি একপায়ে খাড়া। খোঁড়া হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু নেমন্তন্নর খবরটা যখন ইতুদি এনেছে, তখন কেমন যেন অবিশ্বাস হতে লাগল। শিব্রামদাকে আমার মনের ভাব বলাতেই তিনি পরম আশ্বাসের সুরে বললেন, ভোরবেলায় ও কি দাদার কাছে তিন সত্যি করে মিথ্যে বলবে? সে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নাও।

এক ঝলকে আমার সেই রেস্টুরেন্টের ছবিটা মনে পড়ে গেল। আমরা সবাই মিলে খুব খাচ্ছি। শিব্রামদা খাচ্ছেন, ইতুদি খাচ্ছেন, ইতুদির বেথুন কলেজের বান্ধবীরা খাচ্ছেন, সবাই মিলে গোবর্ধন বাবুর পার্টিতে মজা করে খাচ্ছি। কিন্তু কেমন যেন হল। গোবর্ধন বাবু বিল মেটাবার সময় বললেন, আমি যেমন যেমন দিলাম, সবাই তেমন তেমন দিক। শুনে ইতুদির আধখাওয়া প্লেট মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। এই পার্টির ব্যবস্থা শিব্রামদা গোবর্ধনবাবুকে দিয়ে করিয়েছিলেন।

তাই সে কথা ভেবে আমার নেমন্তন্নে যেতে মন উঠছিল না। কিন্তু শিব্রামদার পাল্লায় যখন পড়েছি তখন অগত্যা হিসেবের খাতা মাথায় তুলে শেভ করার সরঞ্জাম নিয়ে বসলাম।

কিন্তু শিব্রামদা আমার এই অহেতুক শেভের কোন হেতু দেখতে পেলেন না। তাই এমনভাবে চেঁচিয়ে চাঁদিতে চাঁটি মেরে বসলেন, আমার কিছুতেই মনে হল না যে, এ সিঁদ দিয়ে সিধে হওয়া শিব্রামদা। আমার যেন কেমন মনে হল, এ সেই প্যালা, ক্যাবলা, হাবুলের পটলডাঙ্গার টেনিদা, যে গড়ের মাঠে গোরা ঠেঙ্গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবু শিব্রামদার চাঁদির চাঁটি সহ্য করে Shave করে নিলুম। নিজেকে Save না করতে পারলেও Shave করে নিতে দোষ কি।

ধোপার দেওয়া জামা কাপড় পরে ধোপদুরস্ত হয়ে শিব্রামদার পেছু পেছু যাচ্ছি, হঠাৎ শিব্রামদা সচকিত হয়ে উঠলেন। চকিতে গায়ের উত্তরীয়টা দিয়ে মাথাটা মুড়ে নিলেন। আমায় বললেন, হাঁরে শিবুরাম রোদের বেজায় তেজ, না?

আমার মনে হল, শুধু রোদের তেজ নয় অন্য কিছুর তেজ সামনেই ঝকঝক করছে।

সামনে তাকিয়ে দেখি গলির মোড়ে একটা কাবুলি দাঁড়িয়ে আলুকাবলি খাচ্ছে। বুঝলুম শিব্রামদা এরই তেজে উত্তরীয়



মুড়ে দিয়ে এর কাছ থেকে উৎরে যেতে চান এবং সত্যি সত্যি গেলেন। পাশের গলি দিয়ে গলে গেলেন। আমি তার পেছু পেছু।

এরপর তিনি এ গলি সে-গলি নানা গলি পার করে একটা গলির চল্লিশ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমিও পেছু পেছু।

শিব্রামদা আমায় বললেন, ওহে শিবুরাম, দেখ তো হে, ছোট কাঠের বোর্ডে কি টাঙিয়েছে।

আমি দেখেই আঁৎকে উঠলাম, এ কি! আমি বললুম, শিব্রামদা, টু লেট।

শিব্রামদা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, তা তো হবেই। তোমার পাল্লায় পড়ে টু লেট তো হবেই।

আমি তাঁর ভুল শোধরাবার চেষ্টায়·বলি, তা নয়, টু লেট—বাড়ী ভাড়া।

এমনি সময় তিনতলার জানালা খুলে এক ভদ্রলোক বললেন, ভাড়া নেবেন তো আসুন না। ঐ দরজা দিয়ে আসুন।

শিব্রামদা ওপর দিকে চেয়েই আবার উত্তরীয় ঢাকা দিলেন। এবার আর তার চোখ দুটো কুৎকুৎ দেখা গেল না। সারা মাথা মুখ সোজা মুড়ে দিলেন। আমায় চাপা গলায় বললেন, শিবা—গোবর্ধন, কুইক।

আমার অপেক্ষা আর তিনি করলেন না। সোজা উল্টো গলি দিয়ে বোধ হয় উল্টোডাঙ্গা পাড়ি দিলেন।

সেই রবিবারের পর আরো তিনটে রবিবার কেটে গেছে। কিন্তু শিব্রামদার আর দেখা নেই। পথে নেই, ঘাটে নেই, কোথাও নেই। এতবড় ঘোলটা তিনি সচরাচর খান না। তাই বলে কি উনি চরাচর ছেড়ে চলে গেলেন? ...."

এমনি সময়ে 'শিবুরাম' বলে বাইরে দরজা থেকে হাঁক এল। শিবুরাম ডায়েরী বন্ধ করে দরজা খুলে দিয়ে দেখে, শিব্রামদা।

এক মজার চোর

সে ছিলো এক মজার চোর। থাকতো সে গাঁয়ে। পরতো চুড়িদার পাজামা আর জরি-পাড় পাঞ্জাবী। দিতো মাথায় টুপি।

চুরি করাটা তার পেশা হলেও রোজ রোজ চুরি করার নেশা তার ছিল না। তাছাড়া, রোজ রোজ চুরি করার বহুৎ ঝক্কি-ঝামেলা। এসব সে পোয়াতো না। তাই ভেবে চিন্তে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে সে বছরে মাত্র একদিনই চুরি করতে বেরোত। ওই একদিনেই সে সারা বছরের কাজ সেরে নিতো। বাকি দিনগুলোয় সে গাঁয়ের ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে শুধু চোর চোর খেলতো।

এরকম একদিন এলো যেদিন চোর বেরোবে চুরি করতে। সেদিন ছিলো ফুটফুটে পূর্ণিমা। সে বিকেল-বিকেলই চুড়িদার পায়জামা পরে, মাথায় টুপি দিয়ে তৈরি হলো। তারপর ঘরময় পায়চারি করে খানিক ভেবে নিল। ভেবেচিন্তে সে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেল ঢকঢক করে।

তখন বিকেলের আলো ফুটফুটে পূর্ণিমার হাত ধরেছে। চোর ঘরের জানালা দিয়ে তাই খানিকক্ষণ দেখল। তারপর টুক্ করে পথে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে সে তার নিজের গাঁ পার হলো। শহর তখনো অনেক দূর। সে গান গাইতে গাইতে হাঁটতে লাগল।

খানিকবাদে সে গান থামাল। তার নজর পড়ল বিলের ধারে। সেখানে দুজন শেঠিয়া নীচু হয়ে আঁজলাভরে জলপান করছে। হাতের লাঠি বগলে চাপা।

চোর বিলের দিকেই গেল। তার চলা বেড়ালের মতো, পায়ে কোন শব্দ নেই। কিন্তু শেঠিয়াদের কান কুকুরদেরও হার মানায়। তারা চমকে উঠে পেছন ফিরে চাইল। বগলে চাপা লাঠি ছুটো গেল

পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চোর বিদ্যুতের ঝলকের মতো তাদের লাঠি দুটো নিয়ে নিল আর তাই দেখে শেঠিয়া দুজন কেঁদে ফেলল।

আহা, মিছিমিছি আপনারা কাঁদছেন কেন, চোর বলল।

চোরের কথায় ওরা আরো জোরে কেঁদে উঠল। এবার চোর হেসে ফেলল। তারপর পট্ করে দুটো লাঠির একটা ভেঙ্গে ফেলল। তার ভেতর থেকে বেরোল দুটো মুক্তোর দানা। সে আরেকটা লাঠি ভাঙ্গতে গিয়েও ভাঙ্গল না, যার লাঠি তার হাতে ফিরিয়ে দিল। ততক্ষণে শেঠিয়াদের কান্না গেছে থেমে। ওরা ভয়ে পাথর বনে গেছে। চোরকে ওরা চিনত।

চোর বলল, আমি চোর। ছিনতাইবাজ বা ডাকাত নই। আপনাদের সঙ্গে একটু রগড় করলাম।

সে মুক্তোর দানা দুটো শেঠিয়াদের ফিরিয়ে দিল। ভাঙ্গা লাঠিটা ছুঁড়ে ফেরত দিয়ে বলল, আপনারা চললেন কোথায়? শহরে? রাজবাড়িতে?

শেঠিয়া দুজন কোন রকমে মাথা ঝুঁকিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

আমার একটা উপকার করবেন? চোর বলল।

শেঠিয়া দুজন ভুরু কোঁচকাল। তারপর বলল, বলুন।

রাজামশাইকে আমার কথা আগাম জানাবেন। আজ রাতে আমি তাঁর শহরে চুরি করতে যাচ্ছি।

শেঠিয়ারা ঘাড় নাড়ল। এরপর একটুও দেরী না করে জোর কদমে হেঁটে এগিয়ে গেল।

চোর আবার গান ধরল।

রাত তখন গভীর। আকাশে ভরা চাঁদ। চোর শহরে ঢুকল।

সে চলতে চলতেই ভাবল, সেপাইসান্ত্রী কারো কোন সাড়া শব্দ নেই কেন শহরে! কুকুর-টুকুরের আওয়াজও তো শোনা যায় না। সে দুপাশে সারি সারি ঘুমন্ত বাড়ির মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল।

চোর শহরের অনেক পথ হাঁটল। কোথাও কোন সেপাইসান্ত্রীর

দেখা না পেয়ে সে যা বোঝার বুঝলো। একটা প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করতে করতে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

চোর এবার চুরি করার জন্য একটা বাড়ি বেছে নিল। সে গুটি গুটি সেই বাড়ির পাঁচিলের ধারে দাঁড়াল। ঠিক এই সময়ে কে একজন ওই বাড়ির পাঁচিল থেকে ঝুপ্ করে নামল। চোর মুহূর্তে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মিশে গেল।

যে পাঁচিল থেকে নামল, তার পোশাক-আশাক এই চোরের মতোই। সে নেমে এদিক ওদিক চোরকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু না পেয়ে ডাকতে থাকল, ভাই, কোথায় গেলে? আমি তোমার দোসর। এস, ভয় নেই।

এইভাবে অনেক ডাকাডাকির পর মজার চোরকে দেখা গেল। সে প্রশ্ন করল, তুমি কে?

আমি এই শহরের চোর। আমি রোজই চুরি করতে বেরোই।

আমি বছরে একদিন চুরি করি।—মজার চোর জানাল।

তাই নাকি?—শহুরে চোর অবাক হলো।

আচ্ছা, আজ শহরে সেপাইসান্ত্রী নেই কেন? মজার চোর জানতে চাইল।

আমিও তো ভাই তাই দেখছি। ব্যাপার তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমি কদিন এই শহরে ছিলাম না তো।—শহুরে চোর জবাব দিল।

মজার চোর সেই ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় শহরের চোরের পোশাক দেখল। তারপর মুচকি হেসে বলল, তাহলে চুরি করতে যাওয়া যাক।

—হ্যাঁ চল, তোমাকে আমি পথ দেখাই।

শহুরে চোর আগে আগে। মজার চোর তার পিছে পিছে। প্রথমে তারা শহরের এক বড় আড়ৎদারের বাড়ির কাছে এলো। শহুরে চোর বলল, আমি সদরে পাহারায় থাকি। তুমি ভেতরে যাও।

মজার চোর শহুরে চোরের কথামতো আড়ৎদারের বাড়ির ভেতরে গেল। কিন্তু খানিকবাদে বেরিয়ে এলো। শহুরে চোর বলল, এ কী, তোমার হাত খালি কেন?

না ভাই, এখানে চুরি করা গেল না। আমি এ বাড়ির নুন খেয়ে ফেলেছি।

নুন খেয়েছো? শহুরে চোর অবাক হল।

হ্যাঁ, জানো না? নুন খেলে গুণ গাইতে হয়। নেমকহারামি করা চলে না।

তা, কি করে নুন খেলে? শহুরে চোর প্রশ্ন করে।

তখন মজার চোর বলে, আমি আড়ৎদারের বাড়িতে গুদাম ঘরে তো ঢুকেছি। সেখানে হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম, বস্তা বস্তা চিনি রয়েছে। একটা বস্তা থেকে ছোট ঢেলা নিয়ে যেই না মুখে দিয়েছি দেখি, থুঃ থুঃ নুন! ব্যস, আর চুরি করা হল না।

শহুরে চোর বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে।

এরপর তারা এসে দাঁড়ালো হারে-জহরতের এক বড়ো ব্যবসায়ীর বাড়ী। এবারও শহুরে চোর সদরে দাঁড়ালো, মজার চোর গেল ভেতরে। খানিক বাদে মজার চোর বেরিয়ে এলো শুধু হাতে।

শহুরে চোর শুধালো, কি হলো আবার?

এবার এক মজার কাণ্ড হয়েছে। মজার চোর বলতে লাগলো, আমি তো নানা কসরৎ করে ঢুকেছি ব্যবসায়ীর শোবার ঘরে। কিন্তু মুশকিল হল ব্যবসায়ীর বউকে নিয়ে। ঘুমের ঘোরে সে বকর বকর করছে! হঠাৎ ঝপ্ করে বলে ফেলল, ভাই, এসেছ, বসো। ব্যস, চুরি করা উঠলো মাথায়। বোনের বাড়ি কি ভাই চুরি করতে পারে?

শহুরে চোর মনে মনে বলল, এ চোরটা তো অদ্ভুত। অনেক কিছু মেনে চলে।

আচ্ছা ভাই, এবার চল রাজবাড়িতে। শহুরে চোর পরামর্শ দেয়।

তুমি কি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে নাকি? তুমি চুরি করবে কখন? মজার চোর প্রশ্ন করে।

তোমার পরে আমি চুরি করব। আর একদিন নাইবা করলাম চুরি। শহুরে চোর বেশ সহানুভূতি দেখায়।

এদিকে তখন ভোর হয় হয়। আকাশে শুকতারা ফুটি ফুটি। শহুরে চোর আর মজার চোর তাড়াতাড়ি পা চালায় রাজবাড়ির দিকে।

সেখানে সান্ত্রী ঘুমিয়ে রয়েছে দেউড়িতে। তারা নিঃশব্দে দেউড়ি পেরিয়ে রাজার ধনশালার দিকে এগিয়ে গেল। ধনশালার দরজায় একজন সান্ত্রী। সেও ঘুমিয়ে। আর আশ্চর্য ধনশালার দরজা হাট খোলা।

মজার চোর আবার মুচকি হাসল। তারপর সোজা ঢুকে গেল ধনশালার ভেতরে। এবারও শহুরে চোর থাকল দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

খানিকবাদে মজার চোর ফিরল। দু-দুটো মোহরের ঘড়া তার হাতে।

সে বলল শহুরে চোরকে, তুমি একটা নাও ভাই।

কেন? আমাকে দিচ্ছ কেন? শহুরে চোর বলল।

কেন আবার? এবারকার চুরিতে তুমি আমার সাথী। চুরির আধা-ভাগ তোমার প্রাপ্য।

মজার চোরের কথা শেষ হতে না হতেই রাজবাড়ির একটা পাখি ডেকে উঠল। কান খাড়া করে পাখির ডাক শুনলো মজার চোর। তারপর সে শহুরে চোরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, প্রাতঃপ্রণাম গ্রহণ করুন রাজা।

শহুরে চোর চমকে উঠল। আমি যে রাজা, চোরটা বুঝলো কি করে! আশ্চর্য তো!

ছদ্মবেশী রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে চিনলে কি করে?

তখন মজার চোর ধীরে ধীরে বলল, আপনার পোশাক এবং

ব্যবহার দেখে আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। আপনার পাখি আমার সেই সন্দেহ দূর করে দিল। আমি পাখির ভাষা একটু আধটু জানি।



এতক্ষণ ধরে রাজা চোরের কাণ্ড দেখে অবাক হচ্ছিলেন। এবার চোরের পাণ্ডিত্য ও বিনয় দেখে মুগ্ধ হলেন।

প্রভাতকালীন দরবারে রাজা চোরকে তাঁর সভাসদমণ্ডলীর একজন করে নিলেন।

কানে ভুলোর দেশে

(মঞ্চে আধা-আলো অন্ধকার। কারণ সময়টা বিকেল। স্থান : একটি রাস্তা। আশ-পাশের বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ। ভিন দেশীয় এক সন্ন্যাসী ও তাঁর শিষ্য এই সময়ে ঢুকলো।)

সন্ন্যাসী ॥ ভোম্বল !

শিষ্য ॥ গুরুদেব !

সন্ন্যাসী ॥ এ কোন্ দেশে এলাম হে ?

শিষ্য ॥ আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, গুরুদেব !

সন্ন্যাসী ॥ কেমন এক শ্মশানপুরী বলে মনে হচ্ছে না ?

শিষ্য ॥ আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী ॥ এই হলুদরাঙা বিকেলে একটাও লোক দেখা যাচ্ছে না। কোথায় ছেলে-ছোকরার দল পার্কে পার্কে হৈ-হৈ করে নেচে বেড়াবে, বুড়োর দল পায়চারী করবে, লোকজন চলবে-ফিরবে, তা নয়—যেন ঘুটঘুট্টি রাত্তিরের মতো চুপচাপ !

শিষ্য ॥ আমরা আসতে আসতে কেমন বাদুড়ের ওড়া আর শেয়ালের দৌড়াদৌড়ি দেখতে দেখতে এলাম গুরুদেব !

সন্ন্যাসী ॥ আশ্চর্য !

শিষ্য ॥ অদ্ভুত !

(এমন সময় 'টকেসের চাই, টকেসের চাই' হাঁকতে হাঁকতে একজন ফেরিওয়ালা ঢুকবে। তার মাথায় হাঁড়ি, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, হাতে শাকের বোঝা, পিঠে একটা বস্তা, আর দু' কানে বড়ো বড়ো তুলোর পট্টি গোঁজা।)

সন্ন্যাসী ॥ ভোম্বল ! মনে হচ্ছে এ ফিরিওয়ালা, একে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস কর ত !

শিষ্য ॥ এই ফেরিওয়ালা !

(ফেরিওয়ালা উত্তর দেবে না। শুধু 'টকেসের' হাঁকবে। দু-তিনবার জোরে জোরে ডাকার পরেও যখন শুনতে পাবে না তখন—) এ, টকেসের !

ফেরিওয়ালা ॥ টকেসেরে কি নেবে বাবাজী !

শিষ্য ॥ নেওয়ার কথা পরে। আগে বলতো দেখি এদেশের নাম কি ? এই ভরা বিকেলে রাস্তা-ঘাটে কোনো লোকজন দেখছি না কেন ? (ফেরিওয়ালা শিষ্যের আপাদমস্তক দেখবে। তারপর সন্ন্যাসীর চারপাশে ঘুরে তাঁর আপাদমস্তক দেখবে।)

ফেরিওয়ালা ॥ বুদ্ধি যে নাই বাবাজী ! বুঝবে কিসে ?

শিষ্য ॥ মানে ? কি বলতে চাও ?

ফেরিওয়ালা ॥ (হঠাৎ কেঁদে ফেলে) বুদ্ধিগুলান যে সব বেরিয়ে গেছেন বাবাজি ! কি হবে বাবাজী ?

সন্ন্যাসী ॥ আরে এ কাঁদে কেন, ভোম্বল ? তুমি কি বললে একে ?

শিষ্য ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) আমি গুরুদেব—মানে আমি—

ফেরিওয়ালা ॥ মানে বাবাজী, কানে যে তুলো নাই গো। এ যে কানে তুলোর দেশ গো।

শিষ্য ॥ তবে কি হবে ?

ফেরিওয়ালা ॥ আর কি হবেন। আমি তুলো দিচ্ছি বাবাজী। শিগ্‌গির কানে গুঁজে নাও।

(ফেরিওয়ালা তার ঝোলার ভেতর থেকে তুলো দেবে। সন্ন্যাসী ও শিষ্য অবাক হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কানে তুলো গুঁজবে।)

সন্ন্যাসী ॥ এবার বুদ্ধি থাকবে তো ?

ফেরিওয়ালা ॥ থাকবেন না কেন বাবাজী—থাকতে হবেনই। আমার দেশের রাজার হুকুম যে।

সন্ন্যাসী ॥ ও বুঝলাম। আচ্ছা বলতো ভাই 'টকেসের' মানেটা কি ?

ফেরিওয়ালা ॥ টকেসের মানে হল কি, তুমি সব পাবে বাবাজী।

শিষ্য ॥ ভালো করে বুঝিয়ে বল টকেসেরওয়ালা।

ফেরিওয়ালা ॥ বলছি, সব বলছি। আগে তোমরা তুলোগুলো ঠিক মতো গুঁজে রাখ। (উভয়ে কানে হাত দেবে)

হ্যাঁ, এবার বুঝবে। টকেসের হল, ভিন দেশীয় তিন পয়সা। এই তিন পয়সা দিয়ে সব পাবে।

টকেসের জামরুল
টকেসের কাঁকরুল
টকেসের চাল,
টকেসের ডাল।

শিষ্য ॥ (উৎফুল্ল হয়ে) রসগোল্লা পাওয়া যাবে ?

ফেরিওয়ালা ॥ পাবেন বাবাজী !

শিষ্য ॥ সন্দেশ ?

ফেরিওয়ালা ॥ পাবেন।

শিষ্য ॥ আহা-হা ! কতদিন রসগোল্লা আর সন্দেশ খাই না ! গুরুদেব, কিনেই ফেলি না কিছু টকেসেরের রসগোল্লা আর সন্দেশ।

সন্ন্যাসী ॥ ভোম্বল, লোভ সম্বরণ কর। এ দেশ বড় সুবিধের নয়। এ দেশে আমাদের আর থাকা ঠিক হবে না।

শিষ্য ॥ একি ভয়ানক কথা বলছেন গুরুদেব ! কতদিন রসগোল্লা আর সন্দেশ খাই না (জিভের জল সামলাবে)

সন্ন্যাসী ॥ না। অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

শিষ্য ॥ না গুরুদেব ! এখানে চিরকাল থাকা ঠিক। কোলকাতায় চালের কষ্ট। রসগোল্লা সন্দেশের কষ্ট। আর এখানে দিব্যি এসব মজার জিনিস খেয়ে নিয়ে এই মোটা শরীরটাকে আরো মোটা করব।

সন্ন্যাসী ॥ তুমি কি আমার অবাধ্য হবে ভোম্বল ?

শিষ্য ॥ একটু হতে ইচ্ছে করছে গুরুদেব !

সন্ন্যাসী ॥ বেশ আমি চললাম। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি তোমার বিপদ হবেই। সেদিন তুমি আমায় স্মরণ করো। (বেগে প্রস্থান)।

ফেরিওয়ালা ॥ কি বাবাজীরা ! তোমরা ঝগড়া করবে—না টকেসের নেবে ?

শিষ্য ॥ নেবো না মানে ? নিশ্চয়ই নেবো। টকেসের রসগোল্লা দাও ! টকেসের সন্দেশ, টকেসের চাল, টকেসের ডাল, টকেসের জামরুল আর—আর-টকেসের লেনচুস আছে না ? বিস্কুট ? দাও ! দাও ! (ফেরিওয়ালা সব দেবে। শিষ্য পেটুকের মতো এটা ওটা খাবে। মুখ ভর্তি করে খেতে খেতে কাশবে। আবার খাবে—এর মধ্যে পর্দা নেমে আসবে।)

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজসভা। রাজা ও মন্ত্রী। রাজার কানে তুলো আছে—মন্ত্রীর নেই। এদের মুখের ভাষা সাধু।]

রাজা ॥ মন্ত্রী ! আমার রাজ্যে এত বড় অন্যায়, এত বড় অনাচার !

মন্ত্রী ॥ কি হইয়াছে মহারাজ ?

রাজা ॥ এতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে কি বলিলাম ? আর এখন বলিতেছ 'কি হইয়াছে মহারাজ' (ভ্যাংচাইয়া) ? তুমি কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ যে আমার রাজ্যে দেওয়াল চাপা পড়িয়া একটি বিড়াল মরিল । এত বড়ো অনাচার কিরূপে হইল ?

মন্ত্রী ॥ তাই তো—কিরূপে হইল ? আমার কেমন মাথা গুলাইতেছে মহারাজ।

রাজা ॥ মন্ত্রী ! এ কি কথা শুনি তোমার মুখে ? এতো ভালো কথা নহে। তুমি আমার মন্ত্রী। মন্ত্রণা দেওয়া তোমার কাজ—আর তুমি

বলিতেছ, কিরূপে হইল ? মাথা গুলাইতেছে ? (হঠাৎ রাজা ডুকরিয়ে উঠবেন) মন্ত্রী !

মন্ত্রী ॥ মহারাজ ! (ডুকরিয়ে)

রাজা ॥ সর্বনাশ ! মহা সর্বনাশ !

মন্ত্রী ॥ (ককিয়ে কেঁদে উঠবে) কার সর্বনাশ হইয়াছে মহারাজ ?

রাজা ॥ আব কার ! তোমার।

মন্ত্রী ॥ আমার ? (উচ্চাসন থেকে ধপ করে নীচে বসে পড়বে)।

রাজা ॥ হ্যাঁ মন্ত্রী তোমাব। তোমার কানে তুলা নাই। তাই সব বুদ্ধি বাহির হইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রী ॥ কি হইবে মহারাজ ! এবার আমার কি হইবে ? (হাত-পা ছুঁড়বে—মাথা চাপড়াবে।)

রাজা ॥ (কয়েকবার ঘুরপাক খাবেন—কানে হাত বুলোবেন, তারপর) শীঘ্র যাও। কানে তুলার পট্টি লাগাইয়া আইস। (মন্ত্রীর প্রস্থান) সেনাপতি !

সেনাপতি ॥ হুকুম করুন মহারাজ !

রাজা ॥ আমার রাজ্যে এতো বড়ো অন্যায় যে দেওয়াল চাপা পড়িয়া একটা বিড়াল মরিবে ? বিড়াল মরিয়াছে কার ?

সেনাপতি ॥ পান্তোয়ার মহারাজ।

রাজা ॥ ইহার জন্য দায়ী কে ?

সেনাপতি ॥ গান্তু।

রাজা ॥ গান্তু কে ?

সেনাপতি ॥ আজ্ঞে, পান্তোয়ার ভীষণ বন্ধু।

রাজা ॥ তবে সেই গান্তুর প্রাণদণ্ড হইবে।

(মন্ত্রী কানে তুলোর পট্টি লাগিয়ে)

মন্ত্রী ॥ মহারাজ, আগে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখুন—কে দোষী ! গান্তু না পান্তোয়া ?

রাজা ॥ তাই তো মন্ত্রী, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। হুট করিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া ঠিক নয়। দেখিয়াছ মন্ত্রী, তুলার কেমন গুণ।

(রাজা হাসবেন)

মন্ত্রী ॥ আজ্ঞে—হেঁ-হেঁ-হেঁ।

রাজা ॥ এইবার তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিয়াছে। আমি নিশ্চিন্ত। ভাবিয়া ঠিক করতো কাহার প্রাণদণ্ড হইবে ?

মন্ত্রী ॥ ভাবিবার কিছু নাই মহারাজ। ভাবিবার কিছু নাই। (মাথা নাড়াতে নাড়াতে)

রাজা ॥ কেন ?

মন্ত্রী ॥ কারণ, হয় পান্তোয়া নয় গান্তু দোষী।

রাজা ॥ তা তো বটেই, তা তো বটেই। তবে কে দোষী তাহা বল।

মন্ত্রী ॥ ইহা মোটেই শক্ত কাজ নয় মহারাজ! উহাদের দুইজনকে ডাকা হৌক।

রাজা ॥ বেশ। সেনাপতি, ডাক গান্তু আর পান্তোয়াকে।

সেনাপতি ॥ পান্তোয়া তো দরবারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাপুস-হুপুস কাঁদিতেছে।

রাজা ॥ তাহাকে লইয়া আইস। (সেনাপতি বেরিয়ে পান্তোয়াকে দরবারে রেখে—আবার বেরিয়ে গেল।)

মন্ত্রী ॥ এই তোর নাম পান্তোয়া ?

পান্তোয়া ॥ হুজুর মা-বাপ। (কাঁদতে কাঁদতে)

মন্ত্রী ॥ চুপ কর ব্যাটা, তোর প্রাণদণ্ড হইবে।

পান্তোয়া ॥ হুজুর মা-বাপ। হুজুর মা-বাপ। আমার আদরের তুলি দেওয়াল চাপা পড়ে ভেটকি মাছ হয়েছে। হুজুর মা-বাপ।

মন্ত্রী ॥ তুলি কে ?

পান্তোয়া ॥ আমার বিড়াল হুজুর। কী হবে হুজুর? আমার

তুলি গেল গান্তুর দেওয়ালে, আর আমি চড়ব আপনার শূলে ?

রাজা ॥ মন্ত্রী, শুনিলে ? গান্তু ব্যাটাই দোষী। (সেনাপতি ঢুকলো)

সেনাপতি ॥ গান্তু হাজির মহারাজ।

রাজা ॥ এই গান্তু তোর প্রাণদণ্ড হইবে।

গান্তু ॥ হায়, হায় ! আমার প্রাণদণ্ড হবে হুজুর ? নিশ্চয় কি আমার প্রাণদণ্ড হবে ! কিন্তু প্রভু আমার দোষ কি ?

রাজা ॥ তুই খুনে। তোর দেওয়াল চাপা পড়িয়া পান্তোয়ার তুলি বিড়াল মরিয়াছে।

গান্তু ॥ সে কি আমার দোষ প্রভু ? যে দেওয়াল বানিয়েছে সেই তো প্রকৃত দোষী।

মন্ত্রী ॥ গান্তু তো ঠিকই বলিয়াছে মহারাজ !

রাজা ॥ সেনাপতি, রাজমিস্ত্রীকে তলব দাও।

সেনাপতি ॥ সে রাজবাড়িতেই কাজ করিতেছে। এখনই ডাকিতেছি। (ভেতর থেকে) রাজার মিস্ত্রী হাজির হো ! রাজার মিস্ত্রী !

মিস্ত্রী ॥ (ভেতর থেকে) হাজির সেনাপতি মশাই, হাজির।

(ছুটতে ছুটতে সেনাপতিসহ ঢুকবে)।

মন্ত্রী ॥ অ্যাই ব্যাটা, তোর প্রাণদণ্ড হইবে। তুই বিড়াল হত্যা করিয়াছিস।

মিস্ত্রী ॥ আমি ? আমি তো কোন বিড়ালের ধারে কাছেই যাই না প্রভু। ওগুলি যে আঁও করে, ঘাঁও করে, খামচি লাগায়।

মন্ত্রী ॥ তোরই দেওয়াল বানাইবার দোষে বেড়াল চাপা পড়িল এবং মরিল।

মিস্ত্রী ॥ ও-হো এই কথা ! তো সে দোষ তো আমার নয়— জোগানদারের।

রাজা ॥ কেন সে দোষ জোগানদারের ? সে কি করিয়াছে ?

মিস্ত্রী ॥ সে আমায় খারাপ জল দিয়েছিল মহারাজ। তাই তো দেওয়ালের গাঁথুনি খারাপ হয়ে গিয়েছে।

রাজা ॥ তবে ডাকো সেই জোগানদারকে।

মিস্ত্রী ॥ জোগানদার আমার সঙ্গেই আছে মহারাজ, এখুনি নিয়ে আসছি ডেকে। (ছুটে ভেতরে যায় তারপর হিড় হিড় করে জোগানদারকে টেনে আনে) এই তো! তোরই দোষে বিড়াল মরেছে। তোর প্রাণদণ্ড হবে।

জোগানদার ॥ আমার তো কোন দোষ নেই গো। ভিস্তিওয়ালা সিমেণ্ট বালিতে যেমন জল দিয়েছে, আমি তেমন মিশিয়েছি।

মন্ত্রী ॥ ইহা সত্যি কথা। ভিস্তিওয়ালাই ইহার জন্য দায়ী।

রাজা ॥ তবে তাহারই প্রাণদণ্ড হইবে। (ইতিমধ্যে ভিস্তিওয়ালা ব্যাপার দেখার জন্য সভায় উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল) ঐ ঐ ভিস্তি-ওয়ালা। সেনাপতি ধর উহাকে। শূলে চড়াও।

ভিস্তিওয়ালা ॥ (একথা শুনেই পালাতে যাবে, সেনাপতি ধরবে) অ্যাঁ আমার প্রাণদণ্ড হবে? না না, প্রাণদণ্ড হবে নচ্ছার হকারের। সেই আমায় খারাপ ভিস্তি দিয়েছিল।

রাজা ॥ তবে যা। শীঘ্র যাইয়া তাহাকে লইয়া আয়। আজ আমার একজনকে প্রাণদণ্ড দিতেই হইবে।

ভিস্তিওয়ালা ॥ এখুনি যাচ্ছি প্রভু। (প্রস্থান)।

রাজা ॥ মন্ত্রী, এই জঘন্য ভয়ঙ্কর অপরাধের বিচার যেরূপেই হউক, আজই শেষ করিতে হইবে। আমার রাজ্যে এই অনাচার আর চলিবে না। বিড়ালের প্রকৃত হত্যাকারীকে শূলে চড়িতে হইবে। এই আমার শেষ কথা।

গান্তু ও পান্তোয়া ॥ মহারাজ কি জয়! মহারাজ কি জয়! কানে তুলোর দেশের কি জয়!

মন্ত্রী ॥ থাম মূর্খের দল। এখন আর গোল করিস না। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে দে।

॥ দৃশ্যান্তর ॥

ভিস্তিওয়ালা ॥ এনেছি মহারাজ—এনেছি। বিড়ালের খুনীকে এনেছি।

মন্ত্রী ॥ এই কোতোয়াল! ইহার শূলে চড়ার ব্যবস্থা কর।

হকার ॥ (অবাক হয়ে) হে ভগবান! কার—কার শূলে চড়ার ব্যবস্থা হবে?

মন্ত্রী ॥ ব্যাটা উল্লুক ভাল্লুক হাতির ডিম—তোর! ব্যাটা বোমপটাস। তোর জন্যই তো বিড়ালটা চাপা পড়িয়া মরিল। তুই ভিস্তি-ওয়ালাকে খারাপ ভিস্তি দিয়াছিস, সেই জন্যই যোগানদার ঠিক-মতো সিমেণ্ট মাখিতে পারে নাই। আর সেইজন্য—

হকার ॥ প্রভু! প্রভু! থামুন। থামুন। আমার মহা সর্বনাশ হয়েছে—মহা—সর্ব—(কানে হাত দিয়া উল্লাসে চীৎকার করবে) না না, আমার সর্বনাশ হয় নাই। হুররে আমি বাঁচিয়া আছি। কানে আমার তুলো ঠিকই আছে, ঠিকই আছে। (কানে হাত দিয়ে স্টেজের এ-মাথা ও-মাথা দৌড়োবে—সেনাপতি হতে ধরে দাঁড় করাবে)।

রাজা ॥ মন্ত্রী, এ ব্যাটা বড্ড ফিচকে। ইহাকে দুইটা বিছুটি পাতার চাবুক দাও। (সেনাপতি বিছুটি পাতা নিয়ে এগিয়ে মারতে যাবে আর তারই নিজের গালে লাগাবে)

সেনাপতি ॥ (একটু বাদে) হো-হো-গেলাম-গেলাম-গেলাম। (ছুটতে ছুটতে চুলকোতে চুলকোতে প্রস্থান)

রাজা ॥ বড্ড গোল হইতেছে।

মন্ত্রী ॥ আপনি কাহাকে বলিতেছেন মহারাজ? (রাজার কানে হাত দিয়ে) মহারাজ, আপনার তুলা পড়িয়া যাইতেছে।

রাজা ॥ (তুলো ঠিক করে) তাই গোলমাল হইতেছে। (মাথায় হাত দিয়ে) যাহা হউক, হকার শূলে যাও।

হকার ॥ মহারাজ শূলে যাবে আপনার হল্লাগাড়ীর পুলিশ। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমি ভিস্তি বিক্রি করছিলাম। সেই পুলিশ

এসে তাড়া দিতেই আমি খারাপ ভিস্তি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি।

রাজা ॥ তাইতো মন্ত্রী। আমারই হল্লাগাড়ির পুলিশের এতদুর আস্পর্ধা। (দাঁত কড়মড় করে) হল্লাগাড়ীর পুলিশকে এখনই শূলে চড়াইয়া দাও।

সেনাপতি ॥ (ছুটতে ছুটতে ঢুকে) মহারাজ সে তো অসুস্থ। আর অসুস্থ লোকের তো শূলে চড়িবার নিয়ম নাই।

মন্ত্রী ॥ হক্ কথা মহারাজ! তবে এক কাজ করা যায়। হল্লাগাড়ীর পুলিশের মতো মোটা-সোটা নাদুস-নুদুশ কাহাকেও শূলে চড়াইলে হয়।

রাজা ॥ তবে খুঁজিতে হয় এমন কে আছে।

সেনাপতি ॥ আছে মহারাজ! একজন মোটাসোটা ভিনদেশীয় লোককে আমি দেখিয়াছি। একবার বাহিরে গিয়া দেখিতেছি। (প্রস্থান) (সকলে চিন্তিতমনে স্টেজের উপর পায়চারী করতে থাকবে। মিনিটখানেক পর সেনাপতি হন্তদন্ত হয়ে শিষ্য ভোম্বলকে নিয়ে ঢুকবে। সেই সময় অপেক্ষমান সকলে "জয় কানে তুলোর দেশের জয়! জয় মহারাজের জয়!" ধ্বনি তুলবে।)

রাজা ॥ ঢেঁড়াদার! ঢেঁড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও। "বিড়াল দেওয়ালে চাপা পড়িয়া মরার অপরাধে কানে তুলো দেশের মহারাজার হুকুমে হল্লাগাড়ীর পুলিশের অভাবে তাহারই মতো মোটাসোটা কেঁদো এক ভিনদেশীয়কে শূলে দেওয়া হইল।"

(ঢেঁড়াদার ঢেঁড়া বাজাতে বাজাতে চলে যাবে)

শিষ্য ॥ হে গুরুদেব! আপনার কথাই সত্য হ'ল। আমি অতি লোভে মরতে চললাম। আমাকে দয়া করুন, আমাকে রক্ষা করুন। (বলতে বলতে কেঁদে ফেলবে) হে প্রভু! আপনি না বলেছিলেন, বিপদের দিনে আসবেন—কই, এবার আসুন। আমায় শূলে থেকে কূলে তুলুন। গুরুদেব- গুরুদেব।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী ॥ জয় মহারাজের জয়! জয় কানে তুলো দেশের জয়!

মহারাজ ও মন্ত্রী ॥ কে? কে?

সন্ন্যাসী ॥ আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। শিষ্যের কান্না শুনে ছুটে এসেছি। কিন্তু মহারাজ, এই অবোধ বালককে শূলে না তুলে আপনার উচিত আমায় শূলে তোলা।



মন্ত্রী ॥ তোমার এত দরদ উথলিয়া উঠিল কেন হে সন্ন্যাসী ঠাকুর?

সন্ন্যাসী ॥ কারণ সে খুব সাধারণ নয় মন্ত্রীমশাই। এই পৃথিবীতে আমি আগে জন্মেছি, অনেক বিচরণ করেছি। এবার এই ছোটদের

সুযোগ দেওয়া দরকার। তা ছাড়া, এই সময়টাই শূলে চড়বার পক্ষে ভালো সময়।

রাজা ॥ কেন?

সন্ন্যাসী ॥ কারণ, এই সময় শূলে চড়লে সোজা স্বর্গে যাওয়া যাবে— এটা যে মাহেন্দ্রক্ষণ, পরম শুভ সময়। যাহোক মহারাজ আর দেরী করা ঠিক নয়। আমি এখনই শূলে উঠব।

মন্ত্রী ॥ খবরদার সন্ন্যাসী! আমি বুড়ো মানুষ, আমি আগে স্বর্গে যাইব।

সেনাপতি ॥ তাহাতে হইয়াছে কি? আমি যুবক মানুষ। আমিই আগে শূলে যাইব।

মন্ত্রী ॥ চোপরাও! তুমি আমার নীচুস্তরের কর্মচারী। তুমি আমার উপর কথা বলিতেছ?

সেনাপতি ॥ চোপরাও! তুমি আমার উঁচুস্তরের কর্মচারী। তুমি আমার উপর কথা বলিতেছ?

রাজা ॥ চোপরাও, চোপরাও তোমরা। আমি এ রাজ্যের রাজা। সকলের আগে আমি শূলে চড়িব। আমি স্বর্গে যাইব।

মন্ত্রী ও সেনাপতি ॥ না, না।

রাজা ॥ হ্যাঁ।

মন্ত্রী ॥ না, না।

রাজা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোতোয়াল! কোতোয়াল আমার শূলের ব্যবস্থা কর। আমি এখনই স্বর্গে যাইব। (ডাকতে ডাকতে বেগে প্রস্থান। পরে মন্ত্রী ও সেনাপতি। তারপর অন্যান্যরা হৈচৈ করতে করতে প্রস্থান।)

সন্ন্যাসী ॥ যেমন রাজ্য, তেমনি তার রাজা।
টকেসের খাদ্য; টকেসের সাজা॥

সন্ন্যাসী ও শিষ্য ॥ জয় কানে তুলো দেশের জয়! জয় কানে তুলো, দেশের জয়!!

(পর্দা নেমে আসবে)

